ISSN-0971-8435

যোজনা

ধনধান্যে

অক্টোবর ২০১৫ | উন্নয়নমূলক মাসিক পত্রিকা | ₹২০

বিশেষ সংখ্যা

দক্ষতা উন্নয়ন : নতুন উচ্চতায় উত্থান

ভারতে দক্ষতা উন্নয়নের নতুন দিগন্ত
দিলীপ চিনয়

চাকরি, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা
অরুণ ময়রা ও মদন পদাকি

অনগ্রসরদের কর্মযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দক্ষতার বিকাশ
সুনিতা সাংঘি

বিশেষ নিবন্ধ

আমাদের ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতের সংরক্ষণ ও প্রসার
মণিকা এস গর্গ

ফোকাস

কারিগরিবিদ্যা ও শিক্ষা ব্যবস্থা
প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনার উদ্ধৃতাংশ

The story of a Man
who became a Mahatma
Read Our Books

Publications Division
Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

e-mail: dpd@sb.nic.in, businesswng@gmail.com
website: publicationsdivision.nic.in
Now on Facebook at www.facebook.com/publicationsdivision

অক্টোবর, ২০১৫

যোজনা

পত্রিকা গোষ্ঠীর বাংলা মাসিক

ধনধান্যে

প্রধান সম্পাদক : **দীপিকা কাচ্ছাল**

সম্পাদক : **অন্তরা ঘোষ**

সহ-সম্পাদক : **পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী**

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৮ এসপ্লানেড ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৬৯

ফোন : (০৩৩) ২২৪৮-২৫৭৬

গ্রাহক মূল্য : ১০০ টাকা (এক বছরে)
১৮০ টাকা (দু-বছরে)
২৫০ টাকা (তিন বছরে)

ওয়েবসাইট : www.publicationsdivision.nic.in

প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব, ভারত সরকারের নয়।

পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বক্তব্য ও বানান আমাদের নয়।

- এই সংখ্যায় ৩
- এই সংখ্যা প্রসঙ্গে ৪

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

- ভারতে দক্ষতা উন্নয়নের নতুন দিগন্ত — দিলীপ চিনয় ৫
- চাকরি, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা — অরুণ ময়রা ও মদন পদাকি ৭
- অনগ্রসরদের কর্মযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দক্ষতার বিকাশ — সুনীতা সাংঘি ১২
- দক্ষ ভারতের লক্ষ্যে — শান্তনু পালধি ১৯
- গ্রামীণ জীবিকা বিকাশের লক্ষ্যে 'আনন্দধারা' — রাজকুমার লস্কর ২৩
- দক্ষতা উন্নয়নের চালচিত্রে ত্রিপুরা — স্তবক রায় ২৮
- কর্মমুখী দক্ষতা সঞ্চারের মাধ্যমে মানব মূলধনের বিকাশ — শচীন অধিকারী ৩২
- মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি — দেব নাথন ৩৫
- সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে দক্ষতা — পূজা গিয়ানচন্দানি ৩৭
- দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার — অধ্যাপক মনোজ যোশী, ড. অরুণ ভাদৌরিয়া ও ড. শৈলজা দীক্ষিত ৪২
- কর্মমুখী দক্ষতার বিকাশ ভারতের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক — এস এস মান্থা ৪৭

বিশেষ নিবন্ধ

- আমাদের ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতের সংরক্ষণ ও প্রসার — মণিকা এস গর্গ ৫২
- গান্ধীজির আর্থ-সামাজিক ভাবনায় দক্ষ, সমৃদ্ধ ভারত — ভব রায় ৫৮

ফোকাস

- কারিগরিবিদ্যা ও শিক্ষা ব্যবস্থা : প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনার উদ্ধৃতাংশ ৬৩

নিয়মিত বিভাগ

- উন্নয়নের রূপরেখা ৬৬
- জানেন কি? ৬৭
- যোজনা ডায়েরি — পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী ৬৯

এই সংখ্যা প্রসঙ্গে

দক্ষ ভারত, সফল ভারত

সাফল্যের জন্য কোনও জাদুমন্ত্র নেই। সফল হতে প্রয়োজন হয় উপযুক্ত ক্ষেত্রে দক্ষতা ও পারদর্শিতার। এই সর্বজনীন সত্য যুব সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। সঠিক দিশায় পরিচালন করতে পারলে, যুব শক্তি যে কোনও দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারে। দক্ষতার উন্নয়ন আর কর্মসংস্থান এই শক্তিকে ত্বরান্বিত করার সর্বোত্তম উপায়।

পৃথিবীর বৃহত্তম যুব মানবসম্পদের অধিকারী ভারত। তা সত্ত্বেও ভারতীয় নিয়োগকর্তারা দক্ষ লোকবলের প্রচণ্ড অভাবে ভুগছেন। কারণ, নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের জন্য উপযোগী দক্ষতার অভাব। শ্রম ব্যুরোর ২০১৪ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতীয় কর্মীবাহিনীর মাত্র ২ শতাংশ রীতি অনুসারে দক্ষতা অর্জন করেছে। এছাড়াও প্রথাগতভাবে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের এক বড় অংশের নিয়োগযোগ্যতা নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তুলেছে বটে, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মোপযোগী হওয়ার মতো দক্ষতা এদের নেই। মহাবিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব যুবক-যুবতীরা পাশ করছে, তাদের প্রতিভা, আর মান ও সুযোগের নিরিখে সেই প্রতিভার নিয়োগযোগ্যতার মধ্যে বিশাল ফারাক আছে। এই ইংরেজি-বলা প্রজন্মের ক্ষমতা আছে দেশের পাশাপাশি সারা দুনিয়ার কর্মদক্ষতার প্রয়োজন মেটানোর। এই বিপুল জনসংখ্যাকে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদের উৎসে পরিণত করতে দরকার উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত দক্ষতা উন্নয়ন আর প্রশিক্ষণ।

নিয়োগযোগ্য ও দক্ষ কর্মীবাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্যে সরকার 'স্কিল ইন্ডিয়া মিশন'-এর সূচনা করেছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে ৪০ কোটি মানুষকে তাদের পছন্দসই কাজের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলা আর তাদের নিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি করা। সার্বিক বিকাশের জন্য সব স্তরে দক্ষ মানবসম্পদ জরুরি। দক্ষতা উন্নয়নকে আলাদা করে বিচার করলে চলবে না। তা দক্ষতার প্রশিক্ষণকে একইসঙ্গে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শুধুমাত্র সরকার ও প্রশাসন একা এ কাজ করতে পারবে না। বেসরকারি ক্ষেত্র, অ-সরকারি সংগঠন, দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে। সব দিকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

যোজনা

যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একই সময়ে, সমাজের অন্যান্য শ্রেণি, যেমন মহিলা, প্রান্তিক বা উপজাতীয়গোষ্ঠীর মানুষদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদাভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রান্তিকগোষ্ঠীর মানুষদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা এক অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে মহিলাদের প্রশিক্ষিত করতে গেলে পারিবারিক সমস্যা ও সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যে কোনও কার্যক্রমকে সফল করতে গেলে এই সব জিনিস মাথায় রাখতে হবে।

ভারত ইতিমধ্যেই উচ্চ আর্থিক বিকাশ হারের পথে এগোতে শুরু করেছে। পরবর্তী পর্যায় যেতে গেলে আমাদের বিশ্ব বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ক্ষেত্র-বিশেষে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু প্রশিক্ষণের বিস্তার নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে টিকে থাকতে দক্ষতার মানোন্নয়নও অত্যন্ত জরুরি। দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোগ সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি (ন্যাশনাল পলিসি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অন্ত্রপ্রেনরশিপ), ২০১৫-তে দ্রুতগতিতে, মান বজায় রেখে, টেকসইভাবে একসঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দক্ষ করে তোলার চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার প্রস্তাব রয়েছে। এই নীতি-কাঠামোর উদ্দেশ্য সারা দেশের সবকটা দক্ষতা সংক্রান্ত প্রকল্প এক ছাতার তলায় আনা। দক্ষতার প্রশিক্ষণের প্রক্রিয়ার জন্য আদর্শ মান নির্ধারণ করা আর জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা এর লক্ষ্য। দক্ষতা আর প্রচেষ্টার যোগফল হল সাফল্য। সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প 'আন্দোলন'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। সরকারের এ সব প্রচেষ্টার সুফল পেতে কিছু সময় লাগতে পারে। অবশ্য, দীর্ঘমেয়াদে 'দক্ষ' ভারতেরই নেতৃত্বে আমাদের এই দেশ 'সমৃদ্ধ' ভারতে পরিণত হবে আর 'কুশল ভারত, কৌশল ভারত'-এর স্লোগান সার্থক হয়ে উঠবে।❑

ভারতে দক্ষতা উন্নয়নের নতুন দিগন্ত

দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার জন্য দেশজুড়ে এখন সাজসাজ রব। বীজমন্ত্র স্কিল ইন্ডিয়া। ভারতকে বিশ্বে মানব সম্পদের প্রধান ঘাঁটি বানাতে দরকার দক্ষ কর্মীবাহিনী। কর্মক্ষম জনসংখ্যায় আমাদের দেশ স্পষ্টতই সুবিধাজনক অবস্থানে। সবচেয়ে উৎপাদনশীল ১৫-৬০ বছর বয়সিদের সংখ্যা ভারতে বেড়ে চলবে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। চাই তাদের দক্ষ করে তোলার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। 'কুশল ভারত' এই এক লক্ষ্যের দিকে আমাদের সবার মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হবে। আলোচনা করছেন **দিলীপ চিনয়।**

রিজার্ভ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টের কথায় ভারতের বিকাশ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৭.৬ শতাংশ বাড়ার হিসেবের পক্ষেই মত দেওয়া হয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ব্যবসা-বাণিজ্য মহলের আস্থা অটুট। কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত উদ্যোগের ফলে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বেড়েছে। মুদ্রাস্ফীতি কম হওয়ায় গ্রাহকদের মানসিকতা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দুনিয়াজোড়া মন্দাভাব সত্ত্বেও, ভারত এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। দ্রুত বিকাশকারী দেশগুলির মধ্যে ভারতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ার ইঙ্গিত মিলেছে।

সরকার চেষ্টার কসুর করছে না। ভারতে কারখানা গড়ে বিদেশে পণ্য বিক্রির জন্য দেশি-বিদেশি সংস্থাকে উৎসাহ জোগাতে বিদেশি প্রত্যক্ষ লগ্নির কড়াকড়ি শিথিল করা হয়েছে। আশা করা যায় মেক-ইন-ইন্ডিয়া বা ভারতে বানাও কর্মসূচির সৌজন্যে কলকারখানা বাড়বে। সেইসঙ্গে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কলকারখানার অংশভাগও বেড়ে যাবে। কলকারখানার জোয়ার আসায় দক্ষ শ্রমিকদের জন্য অনেক বেশি কাজের সংস্থান হবে। এই দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য দেশে এখন কাজ চলছে। সম্প্রতি স্কিল ইন্ডিয়া মিশন চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। মেক-ইন-ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্মার্ট সিটি-র মতো আর সব জাতীয় মিশনের মূল স্তম্ভের ভূমিকা নেবে স্কিল ইন্ডিয়া। এই সব জাতীয় মিশন সফল করতে পারে একমাত্র দক্ষ কর্মীবাহিনী। আর তাহলেই বাড়বে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ, মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং মাথাপিছু আয়। বহু দেশের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যায় তরুণদের আনুপাতিক হার বেশি। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সঠিক দিশা থাকা অপরিহার্য।

শিক্ষা বিস্তারের আরও প্রাগ্রসর এবং প্রায়োগিক প্রক্রিয়ার ব্যাপার স্যাপার সামাল দিতে উন্নত দেশগুলো অধুনা ব্যস্ত। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও বিষয়সূচির সংস্কার-সংশোধন চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের কয়েকটি উদ্যোগের সৌজন্যে দেশের তরুণদের সঠিক প্রয়োজনের দিকে আমাদের নজর ফিরবে। শিক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টি ছিল সব সময়ই। দুর্ভাগ্যবশত, সার্বিক দক্ষতা উন্নয়ন-এর বিষয়ে কিন্তু আমরা জোর দিইনি। জনসংখ্যায় তরুণদের আনুপাতিক হার বেশি থাকার সুযোগ সদ্ব্যবহার করা এবং এক বড় শক্তি হয়ে ওঠার জন্য এটা এখন জরুরি। ভারতকে বিশ্বে দক্ষ মানবসম্পদের প্রধান ঘাঁটি বানাতে আগামী ৫-১০ বছর দেশের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

জনসংখ্যায় তরুণদের আধিক্যজনিত সুযোগ থেকে ভারতের ফায়দা তোলা শুরু করার মাহেন্দ্রক্ষণ এখনই। ২০১৩-র সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত জনগণনার তথ্য অনুসারে ভারতে ১৫-২৪ বছর বয়সিদের হার এখন সবচেয়ে বেশি। কমবয়সিদের অংশভাগ বাড়তে থাকায় স্থায়ী কর্মসংস্থানের বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি, দেশে ইদানীং অর্থনৈতিক বিকাশ নিয়ে টানাপোড়েন শিল্পের সামনে এক চ্যালেঞ্জ খাড়া করেছে।

উল্লেখযোগ্য এক সুযোগ অপেক্ষা করছে ভারতের জন্য। সবচেয়ে উৎপাদনশীল ১৫-৬০ বছর বয়সি মানুষের সংখ্যা দেশে বেড়ে চলবে। সেখানে উন্নত জগৎ এবং কিছু উন্নয়নশীল দেশেও এহেন মানুষ কমতে থাকবে। এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। সত্যিকারের কাজের সুযোগ গড়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে আমরা ধারাবাহিক বিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারি। আগামী ২০২২-এ বিশ্বের ১৫ থেকে ১৭ শতাংশ কর্মী হবে ভারতীয়।

আজকের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে ২০৪০-এর মধ্যে ভারত কর্মক্ষম জনসংখ্যায় চীনকে পিছনে ফেলবে। কর্মক্ষম জনসংখ্যায় আমাদের দেশ স্পষ্টতই সুবিধাজনক অবস্থানে। অবশ্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য শুধুমাত্র এর ভরসাতে থাকলে চলবে না। আমাদের ৫০ কোটি কর্মীর মাত্র ১৪ শতাংশ সংগঠিত অর্থনীতিতে নিযুক্ত। বাদবাকি ৮৬ শতাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রে। এই ৮৬ শতাংশের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নেই। কাজের বাজারে স্বীকৃতিও জোটে না এদের। চ্যালেঞ্জটা এখানেই।

শিক্ষা, দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মধ্যে কোনও তালমিল নেই এখন। ম্যাকিনসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাত্র ৫৪ শতাংশ তরুণ মনে করে মাধ্যমিকের পর আরও ডিগ্রি পেলে চাকরির সুযোগ বাড়ে। উচ্চ বিদ্যালয়ের পর লেখাপড়া ছেড়ে

দেয় ৫৬ শতাংশ পড়ুয়া। এহেন ঘটনা ও ধারণার মধ্যে, জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ কর্মরত ও প্রশিক্ষিত। রিপোর্টে আরও প্রকাশ, ৫৩ শতাংশ নিয়োগকর্তা দক্ষতার অভাবকে কর্মী নিয়োগের পক্ষে এক বড় বাধা মনে করে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তরুণদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নিয়োগকর্তার প্রত্যাশার মধ্যে থেকে যাচ্ছে ফারাক। কাজের বাজারে চাহিদা থাকলেও যোগ্য কর্মীর যথেষ্ট অভাব। জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ হচ্ছে ২৫ বছরের কমবয়সিরা। এসব কোটি কোটি তরুণের জন্য কাজ জুটিয়ে দেওয়াটা দেশের কাছে মস্ত চ্যালেঞ্জ।

দক্ষতার গুরুত্ব দেশ কোন সময় বুঝতে পেরেছে তা খুব জরুরি। ভারতকে 'বিশ্বে দক্ষতার ঘাঁটি' বানাতে সব শিল্প, কর্পোরেট সংস্থা, মন্ত্রক, রাজ্য ও ব্যক্তিকে কাজে হাত লাগাতে হবে।

এই মুহূর্তে, দক্ষতা উন্নয়নের এক ঢেউ লেগেছে। এটা খুব ভালো দিক। বিশ্বে এক অগ্রণী উদীয়মান অর্থনীতি হিসেবে এতে ভারতের শক্তি বাড়বে। লগ্নির গন্তব্যস্থল রূপেও ভারত নিজেকে তুলে ধরতে পারবে।

দক্ষতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, সবার আগে, সরকার একটা আস্ত মন্ত্রকই (দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা) খুলে ফেলেছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম ইতোমধ্যে দক্ষতার এক ব্যবস্থা খাড়া করে ফেলেছে। দেশের ৪৫০-এর বেশি জেলায় ৩৬১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। ৩৭টি ক্ষেত্র দক্ষতা পরিষদ গড়ে উঠেছে। প্রশিক্ষণে অংশীদার হিসেবে কাজ করছে ২৩৫টি সংস্থা। পরের পদক্ষেপ হচ্ছে বর্তমান ব্যবস্থা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সরকারের সমর্থন সুনিশ্চিত করার জন্য নীতি প্রণয়ন। দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নিগম দক্ষতা বাড়ানোর প্রক্রিয়ায় সাহায্য করতে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের বিষয়সূচি ঠিক করেছে। নিগম এ যাবৎ ৫৫ লক্ষ লোককে প্রশিক্ষণ দিতে পেরেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ৬১ শতাংশ কাজ পেয়ে গেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর বিপুল ঘাটতি মেটাতে দ্রুততার সঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

আর একদিকে, স্কিল ইন্ডিয়া মিশন ও স্কিল পলিসি ২০১৫-এর লক্ষ্য ২০২২-এর মধ্যে ৪০ কোটি তরুণকে দক্ষ করে তোলা। এই নীতি চায় এক জোরদার অর্থনীতির উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে। দ্রুততার সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যায় উন্নতমানের দক্ষ কর্মী তৈরি করা। উদ্ভাবনাভিত্তিক উদ্যোগের কৃষ্টি বিকাশ। এসবের ফলে সম্পদ সৃজন ও কাজের সুযোগ গড়ে উঠবে। দেশের সব মানুষের স্থায়ী রুজিরোজগার জুটবে।

সত্তরটির বেশি দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চলছে। প্রশিক্ষণ পেতে যোগ্যতার মাপকাঠি, প্রশিক্ষণের মেয়াদ, খরচপাতি, ফলাফল, নজরদারি ইত্যাদি ইত্যাদিতে প্রতিটি কর্মসূচির নিজস্ব রীতপ্রকরণ আছে। ভারত সরকার নীতি ঝালিয়ে নিচ্ছে। এটা এক ভালো পদক্ষেপ। দক্ষতা উন্নয়ন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার সার্বিক ক্ষেত্রের যুক্তিসম্মত পুনর্গঠনে এটা সাহায্য করবে।

শিল্পমহল থেকেও মিলছে আরও বেশি সাড়া। সামাজিক দায়িত্বের অঙ্গ হিসেবে তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা জোগাতে এগিয়ে আসছে কর্পোরেট ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি। তরুণদের জন্য তারা তাদের লভ্যাংশ লগ্নি করছে। পাওয়ার গ্রিড, এনটিপিসি, কোল ইন্ডিয়া, অম্বুজা সিমেন্টস, এসার, কোকা কোলা এ রকম কয়েকটি নাম। দক্ষতা উন্নয়নে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি খুব আগ্রহী। পাওয়ার গ্রিড, কোল ইন্ডিয়া এবং এনটিপিসি—এই তিন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এ খাতে দিয়েছে ২০০ কোটি টাকার বেশি।

আরেক দিকে, সরকারের উদ্যোগ যেমন প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা—দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের এক অগ্রণী কর্মসূচি, স্কিল লোন স্কিম, দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল যোজনা, নই মনজিল এবং ঋণ নিশ্চয়তা তহবিল অবশ্যই দক্ষতা উন্নয়নে সাহায্য করবে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মতো প্রকল্প আর্থিক পুরস্কারের মাধ্যমে তরুণদের টেনে আনতে সাহায্য করবে। এর ফলে তরুণদের কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এই প্রকল্প ব্যক্তি বিশেষের বর্তমান দক্ষতাকেও স্বীকৃতি দেয়। প্রকল্পে আগামী এক বছরে দেশের ২৪ লাখ তরুণকে শামিল করার লক্ষ্য আছে।

সব মিলিয়ে একটা ভালো লাগার অনুভূতি—ফিল গুড ফ্যাকটর। উন্নত ভারতের জন্য দক্ষতা ব্যবস্থা একটা স্পষ্ট দিশা পাচ্ছে এখন। 'কুশল ভারত, কৌশল ভারত' এই এক লক্ষ্যের সঙ্গে আমাদের একাত্ম হওয়ার এটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। অর্থনীতির ক্ষেত্র বিশেষে বিকাশ হয়েছে বিলক্ষণ। এখন স্কিল ইন্ডিয়া অভিযান চালু হওয়ায় তা আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়বে এবং তার প্রভাবও হবে ঢের বেশি। এর পর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিল্পের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে প্রশিক্ষণের ক্ষমতা সৃষ্টি এবং দক্ষ কর্মীদের যথেষ্ট কাজের সুযোগ নিশ্চিত করা এবং সেইসঙ্গে তাদের কাজের প্রতি যৎপরোনাস্তি মর্যাদা দান।❑

[লেখক NSDC-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও CEO।
email : dilip.chenoy@hsdcindia.org]

চাকরি, কর্মসংস্থান, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা

*প্রযুক্তির জগতে পরিবর্তন আসে অতিদ্রুত। আজকের চালু প্রযুক্তি কালই অচল হয়ে পড়তে পারে। এই পরিবর্তনের হাত ধরে শিল্প ও পরিষেবা ক্ষেত্রেও ঘটে নিরন্তর পরিবর্তন। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পরিস্থিতিতে কোন ক্ষেত্রে ঠিক কত সংখ্যক কর্মীর প্রয়োজন হবে বা কর্মীদের ঠিক কী ধরনের দক্ষতা অর্জন করতে হবে কিংবা কোন দক্ষতা থাকলে এই তীব্র প্রতিযোগিতা বাজারে চাকরিবাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ পাওয়া যাবে তার পূর্বাভাস দেওয়া এককথায় অসম্ভব। এই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কৌশল তবে কী? উদাহরণ-সহ বিশ্লেষণ করেছেন—*****অরুণ ময়রা** ও **মদন পদাকি**।

দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক কাজের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তাটা বিশ্বের অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় ভারতের কাছে অনেক বেশি। অর্থনীতিবিদদের মতে বিশ্বজুড়ে (এর মধ্যে চীনও রয়েছে) জনসংখ্যার বিন্যাস এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার জন্য কাজের উপযোগী বয়ঃসীমার লোকবলের রীতিমতো ঘাটতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু ভারতের ছবিটা ঠিক তার উলটো। কাজের উপযোগী বয়ঃসীমার মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ রয়েছেন এ দেশে। এ দেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৪৭ কোটি মানুষের বয়স ১৮ বছরের কম। ভারত সরকারের ২০১৪ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে প্রতি বছরে এ দেশের শ্রমের বাজারে কাজের উপযোগী বয়ঃসীমার ৬ কোটি ৩০ লক্ষ তরুণ-তরুণী প্রবেশ করে।

এ দেশের জনসংখ্যার বিন্যাসে যুব সম্প্রদায়ের এহেন প্রাধান্যের যে অনেক সুবিধা সে কথা প্রায়শই শোনা যায়। কিন্তু এই সুবিধা অর্জনের জন্য যে কিছু শর্ত পূরণও প্রয়োজন সে কথা কিন্তু অনুচ্চারিতই রয়ে যায়। এ দেশের যুব সম্প্রদায় যতদিন না পর্যন্ত প্রকৃত অর্থেই উপার্জনের উপযুক্ত হয়ে উঠবে ততদিন এই জনবিন্যাসগত সুবিধা অর্জনের স্বপ্নটা অধরাই রয়ে যাবে। কারণ তারা উপার্জন করতে পারলে তবেই তা থেকে ব্যয় ও কিছুটা সঞ্চয় করতে পারবে। আর এই পথ ধরেই দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হবে। দেশের যুব সম্প্রদায় যদি উপার্জন বা ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের উপযুক্ত সুযোগ না পায় বা যে ধরনের জীবনযাপনের স্বপ্ন তারা দেখে তা যদি তাদের নাগালের বাইরে রয়ে যায় তাহলে তাদের মনে অসন্তোষ জন্ম নেবেই। তা থেকে এক সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হবে। এই অস্থিরতার লক্ষণ তো ইতিমধ্যেই দেখা দিতে শুরু করেছে। চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে 'সংরক্ষণ'-এর দাবি উঠছে। কাজের খোঁজে শহরাঞ্চলেই তরুণ-তরুণীরা ভিড় জমাচ্ছেন। সেই সঙ্গে শহরগুলিতে নানান হিংসাত্মক ঘটনায় মদত দিতে দেখা যাচ্ছে যুবকদের।

দেশের যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করে ভারত সরকার দক্ষতা বৃদ্ধি মিশন বা স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশনের মাধ্যমে ৫০ কোটি মানুষকে কর্ম নিযুক্তির উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আর সেই সঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' অভিযানের মাধ্যমে তাদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টির প্রয়াসও চালিয়ে যাচ্ছে। চীনে বিভিন্ন সুবিধার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উৎপাদন কেন্দ্র বা কারখানা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, ইউয়ানের মূল্যবৃদ্ধি (২০১৫-এর আগস্টে ইউয়ানের অবমূল্যায়ন ঘটানোর আগে পর্যন্ত) ইত্যাদি কারণে বিশ্বের উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে চীন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিল। আর সেই সঙ্গে সে দেশের জনসংখ্যার বিন্যাসে যুব সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়েছে ভারতের সামনে। তবে অর্থনৈতিক বিকাশের যে ধারা চলে আসছে তার যদি পরিবর্তন না ঘটানো যায় বা জনস্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির রূপায়ণে আরও উন্নত ব্যবস্থা যদি না নেওয়া যায়, তাহলে হয়তো এই সুযোগের সদ্ব্যবহার ঘটানো যাবে না। সাক্ষ্যপ্রমাণই বলছে যে, ১৯৯০ সাল থেকে অর্থনৈতিক সংস্কার প্রক্রিয়ার সূচনার পর ভারতের গড় জিডিপি (মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন)-এর বিকাশ যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক হলেও অন্যান্য উৎপাদনশীল দেশগুলিতে প্রতি শতাংশ জিডিপি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যত সংখ্যক চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ভারতে তার যৎসামান্যই হয়েছে। বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের 'সাসটেনেবল ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যানালিসিস অব ইন্টারন্যাশনাল কমপ্যারিসনস'-এ এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্যান্য সমীক্ষাতেও এই বিশ্লেষণকে সমর্থন করা হয়েছে। এ দেশে আরও দ্রুত চাকরি-বাকরি তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য মানসিকতা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ঘটানো কতখানি প্রয়োজন তা নিয়েই মূলত এই নিবন্ধে আমরা আলোচনা করব। চাকরি-বাকরির সুযোগ এবং দক্ষতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বর্তমানে বিশ্ব তথা ভারতের

পরিবেশ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সে বিষয়গুলির ওপর আমরা প্রথমে আলোকপাত করব এবং পুরনো ব্যবস্থাপনাকে একেবারে পেছনে ফেলে কীভাবে নতুন প্রযুক্তি এই পরিবেশ পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে আমরা তা ব্যাখ্যা করব। আর সেই সঙ্গে বর্তমানে ভারতের সামনে যে সুযোগ এসেছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটানোর জন্য মানসিকতার বা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন কেন প্রয়োজন তা নিয়েও আলোচনা করব আমরা। সবশেষে, মানসিকতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে একটি উদাহরণও পেশ করব।

ভারতে চাকরি-উদ্যোগ-প্রযুক্তি-দক্ষতা (JETS) ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়সমূহ

ভারতের জনসংখ্যার বিন্যাসের ক্ষেত্রে সুবিধা রয়েছে তা যাতে অচিরে বিপর্যয়ে পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে চাকরি বা কর্মসংস্থানের দক্ষতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে অতিদ্রুত, অতিরিক্ত কোনও কাজ করার চাপ থাকে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে সাধারণত অতিরিক্ত সহায়সম্পদ ও অতিরিক্ত কর্তৃত্ব নিয়ে কাজটি সম্পাদনের একটা প্রথা চলে আসে। এই প্রথা এখনও বদলায়নি। সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যাবে এই আশা নিয়ে এখন শুধু আরও বেশি সহায়সম্পদ ব্যবহার ও বেশি ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, কিছু কিছু এমন নাছোড় সমস্যা রয়েছে সেগুলির মূল কারণটা ধরতে না পারলে গতানুগতিক পথে তার সমাধান সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, বিশ্বজুড়ে এই 'চাকরি-উদ্যোগ-প্রযুক্তি-দক্ষতা' বা 'JETS' ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে এক অনিশ্চয়তার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে শিল্পোদ্যোগ বা চাকরি-বাকরির ধ্যানধারণাগুলোই বদলে যাচ্ছে। খুচরো ব্যবসা, প্রকাশনা, গণ-পরিবহণ, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রের সুবাদে শিল্পেরও আমূল রূপান্তর ঘটেছে। এমনকী ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তির হাত ধরে উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। যেমন, বিরাট কারখানায় বিশাল বিশাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এতদিন যে কাজ হত সেই কাজ এখন থ্রি-ডি প্রিন্টার প্রযুক্তির মাধ্যমে ছোট কোনও ইউনিটে বসেই সেরে ফেলা যায়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রযুক্তির জগতে বিভিন্ন পরিবর্তন আসছে এবং উদ্ভাবনমূলক নানান উপায়ে সেগুলি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এমনকী আগামী দশ বছরে বিভিন্ন কলকারখানার চেহারা বা পরিষেবা শিল্পের প্রকৃতি কেমন হবে তা এখন থেকে বলা খুব মুশকিল। আর খুব স্বাভাবিকভাবেই তখন কোন ধরনের কাজের প্রয়োজন হবে বা তার জন্য ঠিক কী কী দক্ষতা লাগবে তা এখন থেকে বলা এক কথায় অসম্ভব। এই যে অনিশ্চয়তার একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য একটা বিরাট সমস্যা দেখা দিচ্ছে এ দেশে। এর ফলে এ দেশের উদ্বৃত্ত কর্মীবাহিনীকে উন্নত দুনিয়ার বিভিন্ন কাজের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রেও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কারণ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন বা পরিষেবা ক্ষেত্রে যে রূপান্তর আসবে তার প্রভাব সবচেয়ে আগে পড়বে উন্নত দেশগুলিতে। প্রযুক্তির হাত ধরে ভারতের শিল্পক্ষেত্রেও খোলনলচে বদলাবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সে ক্ষেত্রেও এ দেশে ঠিক কোন চাকরির জন্য কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন বা কোন কোন ক্ষেত্রে কত সংখ্যক চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে তার পূর্বাভাস দেওয়াও এককথায় অসম্ভব।

তৃতীয়ত, এ দেশের গ্রামাঞ্চলে চাকরি-বাকরির সুযোগ সৃষ্টির প্রয়োজন ইতিমধ্যেই অতি প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেলে চাষবাসের কাজে আর বেশি মানুষের প্রয়োজন পড়বে না। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপার্জনও বাড়াতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়লেও এই ক্ষেত্রে কিন্তু চাকরি-বাকরি বা কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশের যুব সম্প্রদায় জীবিকার সন্ধানে দ্রুত বিকাশশীল শহরগুলিতেই ভিড় করছে। জনসংখ্যার চাপে এই শহরগুলির ইতিমধ্যেই হাঁসফাঁস অবস্থা। তার ওপর কাজের সন্ধানে আসা মানুষের চাপ। এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য ভদ্রস্থ আবাসন, পানীয় জল, স্যানিটেশন, পরিবহণ ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার জন্য এ দেশের ছোট ও বড় শহরগুলিকে প্রস্তুত থাকতে হবে। নাগরিক পরিষেবাগুলি প্রদানের বহু কাজ এখনও বাকি রয়ে গেছে। নাগরিক পরিষেবাগুলির বিপুল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ভারত সরকারের 'স্মার্ট সিটি' এবং 'AMRUT' প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। তবে আগামী এক দশক বা তার পরবর্তী সময়ে এ দেশের শহরগুলিতে জনসংখ্যার চাপ এত বাড়বে যে তখন সকলের জন্য পৌর পরিষেবার ব্যবস্থা বা চাকুরিপ্রার্থী বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণীর জন্য জীবিকার সংস্থান করা সম্ভবপর হবে না। তাই 'আধুনিক' চাকরি-বাকরির জন্য গ্রামাঞ্চলের তরুণ-তরুণীদের মনে যে আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা পূরণের জন্য গ্রামাঞ্চলেই ভদ্রস্থ জীবিকা অর্জনের এক দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দিকে যত্নবান হতে হবে। গ্রাম বনাম শহর এবং গ্রামীণ বনাম নাগরিক এই তর্কাতর্কির ঊর্ধ্বে এবার উঠতে হবে। দেশের শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চল—উভয় ক্ষেত্রেই উপযুক্ত জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সত্ত্বেও বিশ্বের সর্বত্রই শহরাঞ্চলে আধুনিক চাকরি-বাকরি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানগুলি মোটামুটি জানা। এবার দেশের গ্রামাঞ্চলে আধুনিক জীবিকাগুলির ক্ষেত্রে উদ্ভাবনমূলক সমাধানের পথ খুঁজতেই হবে।

JETS (চাকরি-উদ্যোগ-প্রযুক্তি-দক্ষতা) ব্যবস্থাপনার নতুন বিন্যাস

বড় আকারের যে কোনও কাজের ক্ষেত্রে প্রচলিত তত্ত্ব অনুযায়ী এক বিশাল আকারের সুসংহত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার কথা বলা হয় যা একেবারে ওপর মহল থেকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। যন্ত্রপাতির কলকবজা জোড়া দেওয়া বা অ্যাসেম্বলি লাইনের ক্ষেত্রেও এই মডেলই প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু অ্যাসেম্বলি লাইনের শেষে ঠিক কী জিনিস চাওয়া হচ্ছে, তা যদি আগে থেকে একদম ঠিক করা থাকে তাহলে এই পদ্ধতি খাটতে পারে। শোনা যায় হেনরি

ফোর্ড নাকি একবার বলেছিলেন—'যতক্ষণ গাড়িটা কালো রয়েছে তার ওপর তুমি যে কোনও রং করতে পার।' সেই সময় আর এই সময়ের মধ্যে আজ আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এখনকার কারখানাগুলির কাজকর্মে নমনীয়তা এসেছে। তবে, একটি মোবাইল ফোনের কারখানায় বিভিন্ন ধরনের মোবাইল ফোনই তৈরি হতে পারে, কিন্তু সেখানে কখনওই পোশাক-আশাক বা গাড়ি তৈরি হতে পারে না। তাই একুশ শতকের নীতি রচয়িতা বা দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনকারীদের সামনে এখন ঘোর অনিশ্চয়তা। ঠিক কী কাজ করতে হবে বা কোন কাজের জন্য কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন এখন আর আগে থেকে কিছুই জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে 'অ্যাসেম্বলি লাইন' বা একমাত্রিক সরবরাহ শৃঙ্খলের ধারণা এখন অচল।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে কত সংখ্যক কর্মী থাকলে নির্দিষ্ট কয়েক বছর অর্থনীতির চাকা সচল রাখা যাবে। তার একটা হিসাব করে দক্ষতা বৃদ্ধির বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নিলেও উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী তৈরি নাও হতে পারে। কারণ বিভিন্ন উদ্যোগ ও চাকরির ক্ষেত্রে এ রকম দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীর চাহিদা আদতে বাড়বে। একমাত্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও সরবরাহ শৃঙ্খলের উদ্যোগও অনেক সময়সাপেক্ষ। এ ক্ষেত্রে শেষের দিক থেকে কাজ শুরু করা অনেক সুবিধাজনক।

ঠিক কত সংখ্যক কারখানার প্রয়োজন হবে, বা সেখানে ঠিক কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হবে, তার পর্যালোচনা করতে হবে সবার আগে এবং সেই বুঝে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মীকে তৈরি করতে হবে। কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করার জন্য বিদ্যালয় ও কলেজগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে কিছুটা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিতে পারে। এইভাবেই একজন তরুণ বা তরুণীর জীবনের বেশ কয়েক বছর ধরে এই সরবরাহ শৃঙ্খল বিস্তৃত থাকবে। এই শৃঙ্খলের প্রথম পর্যায়ে একজন তরুণ বা তরুণী মনের মতো চাকরির সন্ধানে বেরোবে এবং শেষ পর্যায়ে বিশেষ ধরনের চাকরি বা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করবে। তারপর, বেশ কয়েক বছর ছোটাছুটির পর দেখা যাবে যে, সে যেই চাকরির জন্য যোগ্য তাতেও টান পড়েছে। আশাভঙ্গের শিকার এ দেশের আরও লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত, আধা-বেকার তরুণ-তরুণীর দলে তারও ঠাঁই হবে। এইভাবেই একটু একটু সামাজিক অস্থিরতার ইন্ধন জমা হবে।

তাই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটানো প্রয়োজন। সাতটি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকবে এই ব্যবস্থাপনা যেমন—

(১) সরবরাহ শৃঙ্খল বা অ্যাসেম্বলি লাইন মডেল এই এখানে অনুসরণ করা হবে না। এখানে প্রয়োজন বুঝে শেষের দিক থেকে শুরু করলেও চলবে না। এ ক্ষেত্রে এমন এক ব্যবস্থা থাকবে যেখানে কী কী চাকরির সুযোগ তৈরি হচ্ছে তা বুঝে তরুণ সমাজ সেই চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নেবে।

(২) শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানার্জন করতে পারে সেই দিকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠনের পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত যাতে শুধু ভালো কর্মী নয় বরং প্রকৃত অর্থেই জ্ঞানান্বেষী তৈরি করা যায় (এমনকী শুধুমাত্র জীবিকার সুযোগ সৃষ্টিকারী উদ্যোগগুলির ক্ষেত্রেও আমরা পরে দেখতে পাব যে কি শিল্পোদ্যোগ গ্রহণকারী ও চাকুরি প্রার্থী উভয়েরই মধ্যে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষমতা থাকা চাই)।

(৩) নিয়োগকর্তাদের দায়বদ্ধতা শুধুমাত্র তাদের উপভোক্তাদের সঙ্গে থাকলেই চলবে না, নিয়োগকর্তাদেরও দক্ষতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠতে হবে। এই ক্রমপরিবর্তনশীল প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের পরিবর্তিত পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের উদ্যোগকেও ঢেলে সাজিয়েই যেতে হবে। এই পরিবর্তনের গতি দিন দিন আরও দ্রুত হবে। তাই শিল্প সংস্থা বা উদ্যোগগুলিকে তাদের কর্ম প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে জারি রাখতে হবে। এবং সেইসঙ্গে তারা কর্মীদের কাছ থেকে যে দক্ষতার আশা করে তা পেতে গেলে তাদের দক্ষতার পরিবর্তন ঘটিয়ে যেতে হবে নিরন্তর। পরিবর্তন যেহেতু খুব দ্রুতগতিতে আসবে তাই কর্মীরা একমাত্র তাদের কর্মস্থলেই নিজেদের কর্মদক্ষতাকে ঝালিয়ে নেওয়া বা নতুন দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন। কারণ কর্মস্থলেই তারা নতুন কর্মপ্রণালী ও নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবেন।

(৪) প্রতিযোগিতা এখন বিশ্বব্যাপী। প্রতিযোগিতা এখন শুধু বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছ থেকেই নয় বরং দেশের বিভিন্ন শিল্পই একে অপরের প্রতিযোগী। যে সমস্ত শিল্প সংস্থা বা উদ্যোগ (এবং নিয়োগকর্তা) অন্যান্য শিল্প সংস্থার চেয়ে আরও দ্রুত শিক্ষালাভ করতে পারবে বা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে একমাত্র সেগুলিই সাফল্যের মুখ দেখবে। এই কারণেই শিল্প সংস্থা বা শিল্পোদ্যোগগুলিকে আরও দ্রুত ও আরও ভালো করে পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নেওয়ার উপযোগী হয়ে উঠতে হবে।

(৫) যে কোনও শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেই একমাত্র মানবসম্পদই পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের দক্ষতার উন্নতি ঘটাতে পারে। মানবসম্পদই একমাত্র সম্পদ যার কখনও অবমূল্যায়ন ঘটে না, বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা যত শিক্ষালাভ করে ততই তাদের মূল্য বাড়ে। যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, মালমশালা, ভবন—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সব সম্পদের মূল্য কমতেই থাকে। তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল এই দুনিয়ায় প্রযুক্তির হাত ধরে শিল্পকে শুধুমাত্র 'ডিজিটাইজ' না করে তাকে আরও 'মানবিক' করে তোলার ওপর লক্ষ দিতে হবে নিয়োগকর্তাদের।

(৬) JETS ব্যবস্থাপনার বিন্যাসে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আনা দরকার। এটাকে কোনও বাঁধাধরা বা ছকেবাঁধা সরবরাহ শৃঙ্খল করে তুললে চলবে না। কর্মীরা যাতে শিখতে পারে এবং এই শিক্ষালাভ জারি রাখতে পারে সে জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে বিশেষ জ্ঞান রয়েছে এমন শিল্প সংস্থাগুলিকে নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু তৈরি (কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট), প্রশিক্ষণে সহায়তা,

শিক্ষকদের তৈরি করা বা শিল্পোদ্যোগীদের তত্ত্বাবধান—এই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞরা থাকবেন। অন্যান্য যাঁরা এই একই ধরনের পরিষেবা দিচ্ছেন এঁদের প্রতিযোগিতাটা হবে তাদের সঙ্গে। যাদের পরিষেবা উন্নত, প্রতিযোগিতায় তারাই এগিয়ে যাবে। JETS ব্যবস্থাপনায় নতুন নতুন উদ্ভাবন আনতেই হবে।

(৭) উপভোক্তাদের স্বার্থরক্ষাই হবে সরকারের প্রধান লক্ষ্য এবং শিল্পসংস্থা ও উদ্যোগগুলিকে সরকারের বেঁধে দেওয়া মান অনুসরণ করতে হবে। এছাড়াও প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলি জোট বেঁধে নতুন সংস্থাগুলির পথে যাতে বাধা সৃষ্টি না করতে পারে তা সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও, ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির পক্ষে সম্ভব না হলে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে সরকার 'অভিন্ন' সহায়তা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা দক্ষতা বৃদ্ধির মান সুনিশ্চিত করার দায়িত্ব যাতে নেন সেই নীতিই গ্রহণ করতে হবে। এর ফলে সরকারি সহায়তা সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিয়োগকর্তাদের এই 'অভিন্ন সহায়তা কেন্দ্র'-গুলিকে পরিচালনায় যথাসম্ভব ভূমিকা পালন করতে হবে।

JETS ব্যবস্থায় নানান উদ্ভাবন

চাকরি-উদ্যোগ-প্রযুক্তি-দক্ষতার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার যে পরিবর্তন আসছে তা আমরা এতক্ষণ দূর থেকে পর্যালোচনা করলাম—অনেকটা ঠিক চাঁদ থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করার মতো। এবার আমরা এই ব্যবস্থাপনার ভেতরে ঢুকে দেখার চেষ্টা করব যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে কীভাবে উদ্ভাবনমূলক সব উদ্যোগ গড়ে উঠছে যা নতুন দক্ষতা অর্জন তথা নতুন উদ্যোগ সৃষ্টিতে যুব সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করছে। এ ক্ষেত্রে আমরা অতি পরিচিত 'বেয়ারফুট অ্যাকাডেমি'-র উদাহরণ দিতে চাই, যদিও এ রকম উদাহরণ হাতের কাছে আরও অনেক রয়েছে। পুরনো যে সমস্ত সংস্থার উদাহরণ রয়েছে সেগুলি প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে প্রযুক্তিকে কাজে লাগায় না। অন্যদিকে সম্প্রতি গঠিত যে সমস্ত সংস্থার নিদর্শন এই নিবন্ধে তুলে ধরব সেগুলি ব্যাপকভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে চলেছে।

নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দক্ষতা বৃদ্ধির বিচার; চাকরির সুযোগ সৃষ্টিকারী তথা চাকরিপ্রার্থীর; গ্রামীণ উদ্যোগ; এবং প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার

'গ্রাসাচ্ছাদনের পন্থা বা উপায়'—এইভাবেই 'জীবিকা'-র সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের যুব সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং তারা এমন এক কর্মজীবন বা 'কেরিয়ার' গড়ে তুলতে চায় যার মাধ্যমে উপার্জনের পাশাপাশি সমাজের কাছ থেকে সম্মানও আদায় করা যাবে। দেশের গ্রামাঞ্চলে যেহেতু প্রথাগত জীবিকা ছাড়া এমন কোনও 'কেরিয়ার' বা 'আধুনিক' চাকরির বিশেষ সুযোগ নেই; তাই সেখানকার যুব সম্প্রদায় বাধ্য হয়ে শহরের বস্তি অঞ্চলেই ভিড় করে এবং বড় শহরে এসে যা চাকরি বা যা কাজ পায় সেটাকেই অনেক বড় প্রাপ্তি বলে মনে করে।

ম্যাকিনসের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতকে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে শ্রম বাজারে স্থান দিতে হবে। বৃহৎ ও প্রথাগত বিভিন্ন সংস্থা যেখানে প্রকৃত 'কেরিয়ার' বা কর্মজীবন শুরু হতে পারে সেখানে এই বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রার্থীর স্থান হবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত তরুণ-তরুণীর সফল 'কেরিয়ার'-এর আশা কীভাবে পূরণ করা যাবে? একমাত্র নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এরা বিকল্প 'কেরিয়ার'-এর সন্ধান পেতে পারেন। হেড হেল্ড হাই (HHH) এই ধরনের নতুন উদ্যোগ তথা দৃষ্টিভঙ্গির এক অন্যতম সফল উদাহরণ। এই সংস্থা দেখিয়েছে যে ভারতের গ্রামাঞ্চলেও দ্রুততার সঙ্গে আধুনিক 'জীবিকা'-র বহু সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই সংস্থার বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেলে বহু তরুণ-তরুণীই তাদের জেলার মধ্যে বা তার আশপাশেই থাকতে বেশি পছন্দ করবে এবং এই ধরনের তরুণ-তরুণীর সংখ্যাটা নেহাত কম নয়। তাই এই ধরনের যত বেশি সংখ্যক তরুণ-তরুণীকে নিজস্ব শিল্পোদ্যোগ গ্রহণে উৎসাহিত করে তোলা যাবে চাকরির ক্ষেত্রের সংকট মোকাবিলার ক্ষেত্রে ততটা সাফল্য পাওয়া যাবে। শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করে এই সমস্ত তরুণ-তরুণী চাকুরিপ্রার্থী হয়ে থাকার বদলে নিজেদের জেলায় আরও অনেক যুবক-যুবতীর জন্য চাকরি তথা 'কেরিয়ার'-এর সুযোগ তৈরি করে দিতে পারবেন।

গ্রামীণ ভারত সম্বন্ধে সাধারণ জনমানসে একটা ভুল ধারণা রয়ে গেছে। অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা যে কম্পিউটার সংক্রান্ত জ্ঞান বা কথোপকথনের দক্ষতা, তথা যুক্তি দিয়ে বিচার ক্ষমতা ও বিচার বুদ্ধির অভাবে গ্রামাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের কাছে আধুনিক চাকরি-বাকরি বা কেরিয়ারের সুযোগ অধরা রয়ে যায়। কিন্তু একটু খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে গ্রামীণ ভারতের মূল চরিত্র কিন্তু এখন বদলাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের এখনকার প্রজন্মের হাতের নাগালেই কিন্তু শহরাঞ্চলের ছেলেমেয়েদের মতো সমস্ত তথ্য রয়েছে। জানার ও শেখার খিদেটা তাদের কোনও অংশে কম নয়, বরং বেশি। তাদের মধ্যে নতুন উদ্যোগ গ্রহণের একটা মানসিকতা এমনকী সেই উদ্যোগকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার একটা জেদও রয়েছে।

প্রযুক্তির দিক থেকেও গ্রামাঞ্চল অনেক পিছিয়ে রয়েছে সাধারণভাবে একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু উত্তর কর্ণাটকের চারটি জেলায় ১ হাজার জনকে নিয়ে HHH যে সমীক্ষাটি চালিয়েছিল তাতে দেখা গেছে যে সমীক্ষার ৫৩ শতাংশ মানুষই স্মার্ট ফোন ব্যবহার করেন এবং তাদের মধ্যে ৭৩ শতাংশের আবার মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট সংযোগ রয়েছে। আবার বৈদ্যুতিন বাণিজ্য বা ই-কমার্সের ওপর ১০০ জনকে আমরা যে সমীক্ষা করেছিলাম তাতে দেখা গেছে যে, যাদের নিয়ে সমীক্ষা তদের ৯০ শতাংশই অনলাইনে কেনাকাটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল এবং তাদের ৪৭ শতাংশ নিজেরা অনলাইনে কেনাকাটার চেষ্টাও করেছেন। প্রত্যন্ত

গ্রামাঞ্চলেও আজ উন্নত প্রযুক্তি ঢুকে পড়েছে এবং সেখানকার তরুণ সম্প্রদায় যে স্বচ্ছন্দে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তা এই সমীক্ষাগুলি থেকে স্পষ্ট।

গ্রামাঞ্চল বা জেলাস্তরে চাকরি-বাকরি বা 'কেরিয়ার'-এর সুলুক সন্ধান, দক্ষতা বৃদ্ধির বা শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এছাড়াও, গ্রামাঞ্চলের তরুণ-তরুণীরা নিজেদের প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী যাতে বিভিন্ন পেশা বেছে নিতে পারে সে জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিং-এর কাজেও প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে কোনও 'কেরিয়ার' বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়ার ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা যাতে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে পারে সে জন্যও তাদের হাতের নাগালে প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আধুনিক প্রযুক্তি এখন এমন এক মঞ্চ তৈরি করে দিয়েছে যেখানে চাকরি প্রার্থীরা নিজের দক্ষতা অনুযায়ী চাকরির সন্ধান করতে পারছেন। আর সবচেয়ে বড় কথা শুধুমাত্র কাজের জন্য যে কোনও একটা কাজ না করে দীর্ঘমেয়াদি 'কেরিয়ার'-এর কথা মাথায় রেখে কাজের সন্ধানে নামতে পারছেন তারা।

হেড হেল্ড হাই সংস্থাটি প্রযুক্তি-ভিত্তিক এক বিশেষ শিক্ষণ পদ্ধতি চালু করেছে। এখানে স্বল্পশিক্ষিত তরুণ-তরুণীদেরও চার মাসের মধ্যে ইংরেজিতে কথোপকথন ও কম্পিউটার চালনার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে।

দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উপার্জনের ব্যবস্থা

নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ বা 'কেরিয়ার' গড়ে তুলতে গেলে আমাদের নতুন নতুন বাজারও গড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি একটা বড় ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রযুক্তির সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে যদি এমন কোনও ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা যায় যাতে সেখানকার তরুণ-তরুণীরা বাজার দখলে কর্পোরেটগুলিকে সাহায্য করার পাশাপাশি বিভিন্ন বাণিজ্যিক পরিষেবার জোগান দিতে পারে, তাহলে সেই ব্যবস্থা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হবে। কৃষিক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আর্থিক পরিষেবা, খুচরো ব্যবসা বা জল, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগের মতো পরিষেবায় কর্পোরেটগুলি এগিয়ে আসতে পারে।

হেড হেল্ড হাই সংস্থাটি 'রুবান ব্রিজ' নামক একটি মঞ্চ তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে দেশের গ্রামাঞ্চলকে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই ধরনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বা শিক্ষার প্রসার ঘটানোর পাশাপাশি এখানকার উপভোক্তাদের হাতের নাগালে নানান বিনোদন ও ই-কমার্সের মতো সুযোগও পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে। মাত্র কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় অনেকটাই সফল হয়েছে HHH। এই অল্প সময়ের মধ্যে তৈরি হওয়া নতুন বাজারগুলিতে নতুন নতুন চাকরি ও শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের কর্মহীন শত শত তরুণ-তরুণী এখন নতুন নতুন কাজের সুযোগ পাচ্ছে।

নতুন বাজার তৈরির ক্ষেত্রে HHH সংস্থাটি যে সাফল্য পেয়েছে তা আদতে সরকারের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া' কর্মসূচি রূপায়ণের পথ আরও মসৃণ করে তুলেছে। বিভিন্ন তালুকে কিছু নির্দিষ্ট গ্রামবাসীকে প্রযুক্তি ব্যবহারে সড়গড় করে তুলতে 'ইন্টারনেট সান্তে' বা 'ইন্টারনেট মেলা' (কন্নড় ভাষায় 'সান্তে' শব্দটির অর্থ মেলা) আয়োজনের ব্যবস্থা করেছে এই সংস্থা। সিরা, নারগুন্ড এবং তাভারেগেড়ে-সহ কর্ণাটকের ছয়টি জেলায় দশটি তালুকে এই ধরনের মেলার আয়োজন করা হয়েছে। ৮ হাজারের বেশি মানুষ এই ধরনের মেলায় যোগ দিয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন তথ্য জানতে তথা আয়ের পথ সন্ধান করতে ইন্টারনেট চালিত প্রাসঙ্গিক অ্যাপ ও টুল-গুলি ব্যবহার করেছেন।

পরিশেষে

বিশ্বজুড়ে চাকরি-উদ্যোগ-প্রযুক্তি-দক্ষতার (JETS) যে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা সেখানে নিত্যনতুন পরিবর্তন আসছে। তাই আগামী দিনে শিল্প, কারখানা, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা বিভিন্ন উদ্যোগের প্রকৃতি কেমন দাঁড়াবে তা এখন থেকে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

দেশে দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী রয়েছেন যাঁরা এই দক্ষতা অর্জনে জীবনের অনেকগুলি মূল্যবান বছর ব্যয় করেছেন অথচ তাদের জন্য কোনও চাকরি নেই। এই পরিস্থিতি কিন্তু অতি ভয়ংকর। তার চেয়ে কর্মীরা অদক্ষ তাই তাঁরা চাকরি পাচ্ছেন না—একথা বলে কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়।

দেশের বিভিন্ন শিল্পের জন্য দক্ষতা সৃষ্টিকে লক্ষ্য হিসাবে না ধরে বরং আরও বেশি শিল্পোদ্যোগ গড় তোলাই এখন মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত যেখানে অনেক চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। শিল্পোদ্যোগের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীরাও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করে নিতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা, শিল্পের মধ্যে থেকেই কর্মীরা সবচেয়ে ভালোভাবে দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

প্রযুক্তি কিন্তু সব সমস্যার একমাত্র সমাধান হতে পারে না। JETS ব্যবস্থাপনার মধ্যে প্রযুক্তি একদিকে যেমন বিভিন্ন উদ্যোগের ক্ষতিসাধন করে, চাকরির সুযোগ সংকুচিত করে, তেমনই অন্যদিকে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের পথ খুলে দেয়, দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে। JETS ব্যবস্থাপনার বিন্যাসে এখন পরিবর্তন আনতে হবে—একমাত্রিক সরবরাহ শৃঙ্খল মডেলের পরিবর্তে নেটওয়ার্ক দ্বারা সংযুক্ত বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগের মডেল এখানে বেশি প্রযোজ্য। তারপর আসবে প্রযুক্তি। ভারতের মতো যে দেশে যুব সম্প্রদায়ের জন্য ভদ্রস্থ কর্মসংস্থানের আরও নতুন নতুন উদ্যোগ সৃষ্টি তথা সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল বিকাশের লক্ষ্য পূরণের একান্ত প্রয়োজন সেখানে এই বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। হেড হেল্ড হাই-এর মতো যে সমস্ত সংস্থা প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনী মডেল তৈরি করছে তারা প্রকৃত অর্থেই নতুন পথের সন্ধান দিচ্ছে।❑

[লেখক অরুণ ময়রা, যোজনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য, ভারত সরকার।
লেখক মদন পদাকি, হেড হেল্ড হাই সার্ভিসেস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও।]

অনগ্রসরদের কর্মযোগ্যতা বাড়ানোর লক্ষ্যে দক্ষতার বিকাশ

জনসংখ্যার অধিকাংশই কর্মক্ষম বয়সসীমার মধ্যে থাকায় ভারত জনগোষ্ঠীগত একটা সুবিধা ভোগ করছে। এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারলে ভারত আগামী দিনে বিশ্বে মানবসম্পদের প্রধান জোগানদার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হল দক্ষতার অভাব। বিপুল এই জনসংখ্যাকে কীভাবে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা যায় এবং এ জন্য সরকারি-স্তরে কী কী উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, তারই হদিশ পাওয়া যাচ্ছে **সুনীতা সাংঘি**-*র এই নিবন্ধে।*

জনগোষ্ঠীগত দিক থেকে ভারত একটা বিশেষ সুবিধা ভোগ করছে। ভারতের জনসংখ্যার ৬৫ শতাংশই রয়েছে কর্মক্ষম বয়সসীমার মধ্যে। রাষ্ট্রসংঘের সাম্প্রতিক জনসংখ্যা সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২০ সালের মধ্যে ভারতের গড় বয়স দাঁড়াবে ২৯ বছর, যেখানে চীন ও আমেরিকার ৩৭ বছর এবং ইউরোপের ৪৫ বছর। জনগোষ্ঠীগত এই সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে পারলে ভারত সারা বিশ্বে মানবসম্পদের প্রধান জোগানদারের ভূমিকা নেবে। এ জন্য শ্রমশক্তিকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ঘরোয়া ও বৈদেশিক বাজারের চাহিদা অনুসারে স্থির করতে হবে প্রশিক্ষণের রূপরেখা। কিন্তু আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রতি যে অনাগ্রহ রয়েছে, তার প্রেক্ষিতে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কর্মমুখী শিক্ষার অভাব, দক্ষ প্রশিক্ষকের ঘাটতি এবং নানা ক্ষেত্রে দক্ষতার চাহিদার বৈচিত্র পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ILO ২০০১ সালের যুব কর্মসংস্থান নেটওয়ার্কে চারটি E-কে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করেছে। এগুলি হল 'এমপ্লয়েবিলিটি' বা কর্মসংস্থানের যোগ্য করে তোলা, 'ইকোয়াল অপরচুনিটিস ফর অল' বা সবার জন্য সমান সুযোগ, অন্ত্রপ্রেনরশিপ বা উদ্যোগ এবং 'এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন' বা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ২০০০ সালে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, কোনও ব্যক্তি তখনই কর্মসংস্থানের যোগ্য হয়ে ওঠে যখন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ভিত মজবুত হয়, তারা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সমস্যার দ্রুত সমাধান করতে পারে, অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হয়, দলগত সংহতির মর্যাদা দেয়। দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে গত সাত বছরে বহু নীতি, কর্মসূচি ও প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য।

এই নিবন্ধে আমরা শ্রমের বাজারের বৈশিষ্ট্য, নীতিগত ক্ষেত্রের মূল চ্যালেঞ্জগুলি এবং অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনের দক্ষতার বিকাশে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

অনগ্রসরগোষ্ঠী, শ্রমের বাজার ও দক্ষতার বিকাশ

প্রথমেই মূল প্রশ্ন হল, অনগ্রসর কারা? একজন মানুষ দুটি দিক থেকে বা একসঙ্গে দুভাবেই অনগ্রসর হতে পারে। একটি হল অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা দারিদ্র। অন্যটি হল সামাজিক অনগ্রসরতা, যার মধ্যে পড়ে লিঙ্গ, জাতিগোষ্ঠী বা ভৌগোলিক কারণে বিচ্ছিন্নতা। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ না পাওয়া, স্কুলছুট হওয়া এর বৈশিষ্ট্য।[১] এছাড়া রয়েছেন ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিরা। অর্থাৎ অনগ্রসরতার কারণ বিভিন্ন হতে পারে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবসমাজের দক্ষতা বাড়ে। তারা কাজ পাবার যোগ্য হয়ে ওঠে। তাই নিরক্ষর, স্কুলছুট ও সেভাবে শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া মানুষজনই সবথেকে বেশি অনগ্রসর। অল্প বয়সে তারা শ্রমের বাজারে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়।[২] সামান্য টাকায় নিম্নমানের কাজ করতে করতে তারা দারিদ্র ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় প্রজন্মবাহিত দুষ্টচক্রে জড়িয়ে পড়ে।[৩] তাই দক্ষতার বিকাশে জোর দিতে হলে আগে শ্রমের বাজারের পরিস্থিতিটা বোঝা দরকার।

ভারতে শ্রমের বাজারের ৯২.৯ শতাংশ অসংগঠিত। মাত্র ৮.১ শতাংশ রয়েছে সংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে।[৪] জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ বাস করে গ্রামে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সিংহভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্রে। শ্রমের বাজারে, বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হারও খুব কম। সব বয়সসীমার নিরিখে বিচার করলে এর হার ২২.৫ শতাংশের কাছাকাছি।

শিক্ষাগত দিক থেকে দেখলে, শ্রমের বাজারে নতুন প্রবেশকারীদের ৩০ শতাংশই নিরক্ষর। ২৪ শতাংশ কেবল প্রাথমিক শিক্ষাটুকুই পেয়েছে। শ্রমশক্তির মাত্র ৩০ শতাংশ মাধ্যমিক স্তরের বা তদূর্ধ্ব শিক্ষায় শিক্ষিত।[৫] মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলায় পরিস্থিতি আরও জটিল হচ্ছে। UDISE-এর ২০১৩-১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী পঞ্চম শ্রেণির আগেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয় ২০ শতাংশ শিশু। মাধ্যমিক স্তরে স্কুলছুটের হার ৪৭.৪ শতাংশ। শিক্ষার এই দুরবস্থা, দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রেও

বিপুল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। প্রথাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করে শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে মাত্র ৩ শতাংশ। শ্রমিকদের ৭ শতাংশ কাজ করতে করতে দক্ষতা অর্জন করে (EUS, 2011-12)। অন্যভাবে বলতে গেলে, শ্রমশক্তির ৯০ শতাংশই অদক্ষ। দক্ষতা-নির্ভর পেশার চাহিদা পূরণে তারা অক্ষম। প্রথাগত প্রশিক্ষণ পাওয়া মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা (২৭ লক্ষ ৯০ হাজার) পুরুষদের তুলনায় (৮৬ লক্ষ ৩০ হাজার) আরও কম।

শ্রমশক্তির ৪৮ শতাংশ নিয়োজিত কৃষিক্ষেত্রে। অথচ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন জিডিপি-তে কৃষির অবদান মাত্র ১৬ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকেই কৃষির কম উৎপাদনশীলতা এবং এই ক্ষেত্রের ছদ্ম বেকারত্ব ও পূর্ণ বেকারত্বের ছবিটা স্পষ্ট। কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকাংশই স্বনিযুক্ত। শ্রমশক্তির একটা বড় অংশ রয়েছে নির্মাণ শিল্পের মতো অনুৎপাদক ক্ষেত্রে।

২০১১-র জনগণনা অনুসারে দেশে মোট ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষের সংখ্যা ২ কোটি ৬৮ লক্ষ। এদের মধ্যে ১ কোটি ৫৭ লক্ষ, কর্মক্ষম বয়সসীমার মধ্যে। ১৯৯৫ সালে 'পার্সনস উইথ ডিসেবিলিটি অ্যাক্ট' পাশ হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের যথাযথ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এখনও সম্ভব হয়নি। ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষের হার গ্রামাঞ্চলে বেশি। একদিকে তাঁদের দারিদ্রের মোকাবিলা করতে হয়, অন্যদিকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ জোটে না। গ্রামে থাকা ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষজন, শ্রমের বাজার ও দক্ষতার থেকে অনেকটাই দূরে।[৬]

যুব সম্প্রদায় সবথেকে বেশি অসহায়। ২০১১-১২ সালের NSSO-EUS অনুযায়ী, বেকারত্বের হার পুরুষদের মধ্যে ২.৪ শতাংশ এবং মেয়েদের মধ্যে ৩.৭ শতাংশ। ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সসীমায় এই হার বিভিন্ন বিভাগে ৬.১ শতাংশ থেকে ১৫.৬ শতাংশের মধ্যে। বেকারত্বের হার সবথেকে বেশি শহুরে মহিলাদের মধ্যে—১৫.৬ শতাংশ। এর একটা কারণ হয়তো, পছন্দসই চাকরি না পেলে কর্মহীন থেকে যাওয়া এবং এর পিছনে পারিবারিক সমর্থন। অন্য কারণ হতে পারে সামাজিক বিধিনিষেধ। ১৫-১৯ বছর বয়সসীমায় বেকারত্ব খুব বেশি।[৭] যে ধরনের কাজ তাঁরা আশা করেন, সম্ভবত তেমনটা তাঁরা পান না। গ্রামীণ এলাকায় যুব সম্প্রদায়ের অনেকে কৃষিকাজে নিযুক্ত। প্রথাগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রশিক্ষিতদের মধ্যেও বেকারত্বের হার বেশি। সঠিক কাজ না পাওয়া এবং চাহিদামতো দক্ষতা না থাকা এর একটা কারণ। যে বিভাগেরই হোক না কেন, অনগ্রসর তরুণ-তরুণীদের প্রান্তিকতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পড়ার আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল। যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারত্বের হার বাড়ায় ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন, দক্ষতার অপচয় হচ্ছে, বাড়ছে বিচ্ছিন্নতার আশঙ্কা। শুধু দক্ষতার বিকাশই এই সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট নয়, বাড়াতে হবে কর্মসংস্থানের সুযোগও।

অনগ্রসর শ্রেণির সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার জীবনচক্র সংক্রান্ত সমীক্ষা থেকে স্পষ্ট, অনগ্রসর শ্রেণির মানুষজনকে সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত করতে হলে অল্প বয়স থেকেই তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।[৮] ভারতে যেহেতু জনসংখ্যার ৭০ শতাংশই গ্রামে থেকে পারিবারিক কৃষিকর্মে নিয়োজিত থাকে, তাই তাদের কৃষি ও কৃষি সহায়ক কাজে দক্ষ করে তুলতে হবে। অবহিত করে তুলতে হবে পণ্য, অর্থের জোগান ও শ্রমের বাজার সম্পর্কে। এতে মহিলারাও অংশগ্রহণ করতে পারবেন এবং সামান্য অর্থের কাজের জন্য গ্রাম থেকে শহরে যাওয়া ঠেকানো যাবে। শিক্ষা ও দক্ষতার নিম্ন মানের জন্য শিশুরা স্কুল ছেড়ে অসংগঠিত ক্ষেত্রে সামান্য বেতনের কাজ করতে বাধ্য হয়। উন্নত মানের শিক্ষা প্রদান এবং শিশু ও তাদের অভিভাবকদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা এক বড় চ্যালেঞ্জ। ভালো কাজ পেতে হলে যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যে অপরিহার্য, তা তাঁদের বোঝাতে হবে।

অসংগঠিত ক্ষেত্র দেশ জুড়ে নানা ভৌগোলিক অবস্থানে ছড়িয়ে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কেমন দক্ষতা প্রয়োজন, তা নিরূপণ করার ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে। শ্রমিকরা স্বল্প বেতনে কেবল কাজটুকু কীভাবে করতে হবে, তাই শেখেন। বৃত্তিমূলক শিক্ষানবিশিকে প্রথাগত স্কুলশিক্ষার সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। তাহলে ভালো কাজ পাবার দক্ষতা অর্জনের জন্য অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েরা স্কুলশিক্ষায় উৎসাহিত হবে। মহিলা শিক্ষক, থাকার জায়গা এবং পরিবহণের সুব্যবস্থার অভাবে স্কুলছুটের ক্ষেত্রে মেয়েদের হার ছেলেদের থেকে অনেকটা বেশি, এমনকী দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত কার্যক্রমও সেইসব শিল্পেই বেশি দেখা যায়, যেখানে পুরুষদের প্রাধান্য। মেয়েদের জন্য দক্ষতা বিকাশ কার্যক্রমের রূপায়ণ এক বড় চ্যালেঞ্জ। এর সময়সীমা নমনীয় রাখতে হবে, যাতে মহিলারা এতে সহজে যোগ দিতে পারেন।

শ্রমের বাজারে ঢুকতে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদেরও বহু প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব, আর্থিক সম্পদের ঘাটতি, কর্মস্থল ও কাজের প্রকৃতি, নিয়োগকর্তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি বাধার সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে মূল পক্ষগুলি হল ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি নিজে, সরকার, নিয়োগকর্তা এবং অসরকারি সংগঠন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী নজরদারি, স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের সঙ্গে কারিগরি প্রশিক্ষণের মেলবন্ধন, উৎপাদিত পণ্যের জন্য সহায়তা কাঠামো নির্মাণ, অর্থের জোগানের সঙ্গে কাজের বাজারের যোগসূত্র স্থাপন, শ্রমের বাজার সংক্রান্ত তথ্য এবং জাতীয় স্তরে পেশাভিত্তিক পরিষেবা ব্যবস্থা চালুর মতো নানা চ্যালেঞ্জ আমাদের সামনে রয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, দক্ষতা বিকাশের ব্যবস্থা করা যথেষ্ট জটিল একটি বিষয়। যাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা করা হবে তাঁদের মধ্যে ব্যাপক বিভিন্নতা রয়েছে। স্থান, ভৌগোলিক অবস্থান, লিঙ্গ, সামাজিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠী—সব ক্ষেত্রেই প্রভূত বৈচিত্র। দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশ এবং ক্রমপরিবর্তনশীল প্রযুক্তি, ভালো কাজ পাবার যোগ্যতা ক্রমশই বাড়িয়ে তুলছে।

শিক্ষার উন্নয়ন ও দক্ষতার বিকাশে গৃহীত ব্যবস্থা

শ্রমের বাজারে যাঁরা আছেন অথবা প্রবেশ করতে যাচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে একটা বড়

অংশের শিক্ষাগত ভিত্তি এবং প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। সে জন্যই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান চালু হয় স্কুলছুটের সংখ্যা কমানো এবং মূলগত শিক্ষাকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে। মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে শুরু হয় কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয় আবাসিক কর্মসূচি। আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি, সংখ্যালঘু এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের শিক্ষায় উৎসাহ দিতে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর জন্য আর্থিক বৃত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।[৯] শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়াতে স্বচ্ছ ভারত মিশনের আওতায় স্কুলগুলিতে শৌচাগার নির্মাণ করা হচ্ছে। উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা এবং গোষ্ঠীগত অংশগ্রহণ বৃদ্ধিরও। তবে এখনও লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে ও সচেতনা প্রসারে অনেক কাজ করা বাকি। জাতীয় সাক্ষরতা মিশনের আওতায় ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সসীমায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রয়াস চলছে।

দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে এ পর্যন্ত যেসব কর্মসূচি দেখা গেছে, সেগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত। কিছু ক্ষেত্রে কাজের যোগ্য করে তুলতে শিল্পমহল শ্রমিকদের ফের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ২০১৫ সালের দক্ষতা বিকাশ ও শিল্প পরিচালনা বিষয়ক জাতীয় নীতিতে কোনওরকম বিভাজন না করে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি, সংখ্যালঘু, মহিলা, স্কুলছুট, ভিন্নভাবে সক্ষম এবং দুর্গম জায়গার অধিবাসীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় স্তরেই সরকারি উদ্যোগে এ জন্য বিভিন্ন প্রয়াস চলছে। এগুলির আরও বিস্তার প্রয়োজন। নিতে হবে উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি। বেসরকারি ক্ষেত্রের সক্রিয় অংশগ্রহণও জরুরি। কেবল শিক্ষার্থীদের সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে ফলাফলের ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ যত বাড়বে, ততই তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে শ্রমিকদের প্রস্তুতির ওপর। প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদনশীলতা বাড়বে, সূচনা হবে সর্বাত্মক অর্থনৈতিক বিকাশ ও সামাজিক সংহতির।[১০]

আরও যা প্রয়োজন

স্কুলশিক্ষা সুনিশ্চিত করা : ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত উচ্চমানের শিক্ষা পায়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি এ জন্য ছাত্রবৃত্তির সরাসরি হস্তান্তর, হস্টেলের সুবিধা, মিড ডে মিল প্রকল্প প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছে। এর ফলে স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতির হার বেড়েছে। অভিভাবকদের জন্যও মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন, খাদ্য সুরক্ষা আইন, অটল পেনশন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনার মতো সামাজিক ও আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এগুলির ফলে অভিভাবকরা সন্তানকে উপার্জনের জন্য না পাঠিয়ে স্কুলে পাঠাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। এগুলির রূপায়ণ সঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তার ওপর নজর রাখা দরকার। যারা স্কুলছুট হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের জন্য দূরশিক্ষা বা ই-লার্নিং ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে হবে। এই লক্ষ্যে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ওপেন স্কুলিং একটি সঠিক পদক্ষেপ। যাঁরা স্কুলশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁদের দ্বিতীয় সুযোগ প্রাপ্য। প্রথম ওপেন স্কুল অফ এডুকেশন POSE কর্মসূচিতে স্কুলছুট মেয়েদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি চলছে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণও।

স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন : ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে ধরে রাখতে হলে স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বাস্তব পরিকাঠামোর পাশাপাশি জোর দিতে হবে মানবসম্পদের বিকাশেও। বাড়াতে হবে মহিলা শিক্ষকের সংখ্যা। মহিলা শিক্ষক না থাকায় অনেক গোষ্ঠী মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চায় না। জাতিগোষ্ঠীগতভাবে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা অনেক রাজ্যেও শিক্ষকের প্রভূত ঘাটতি রয়েছে। পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে ভালো মানের শিক্ষক অপরিহার্য। ভারতে এখনও ১১ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন মাত্র শিক্ষক রয়েছেন। ৪০ শতাংশ শিক্ষকের পদ খালি।

কাজের জগতের সঙ্গে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের যোগসূত্র স্থাপন : কাজের জগতের সঙ্গে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার যোগসূত্র স্থাপনের গুরুত্ব ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। নবম শ্রেণি থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচনা ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে থেকে দক্ষতা অর্জনে উৎসাহ জোগাবে। প্রথাগত শিক্ষার সঙ্গে মেলবন্ধন হবে শিক্ষানবিশির। এ ক্ষেত্রে সম্প্রতি শুরু করা শিক্ষানবিশি প্রোৎসাহন যোজনা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় চাহিদা এবং শিক্ষাগত স্তর বিভিন্ন হওয়ায় এমন একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার, যা স্থানীয় চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণের খুঁটিনাটি স্থির করবে। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় শিল্পমহলের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৩ সালে স্থাপিত জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামো সাধারণ শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং উচ্চশিক্ষাকে সংযুক্ত করে একটি সার্বিক ব্যবস্থার মধ্যে আনার চেষ্টা করছে।

পূর্ব জ্ঞানের স্বীকৃতি (RPL) : অসংগঠিত ক্ষেত্রের জন্য ব্যবস্থা তেমন কিছুই নেওয়া হয়নি। অসংগঠিত ক্ষেত্রেই যেহেতু ৮৪ শতাংশ শ্রমিক কাজ করেন, যেহেতু শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে ঘরোয়া প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। এই শ্রমিকরা হয়তো পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছে, কিন্তু হাতে শংসাপত্র না থাকলে এরা কোনও ভালো কাজের জন্য আবেদন করতে পারবে না। বেনারসের শিল্পীদের, ছত্তিশগড়ের ধাতু শ্রমিকদের বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনও বাসিন্দার প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে পারে, কিন্তু কোনও শংসাপত্র না থাকায় তাঁদের অদক্ষ হিসাবেই গণ্য করা হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের দক্ষতার বিকাশে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং কর্মসংস্থানের জন্য এ সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। এই কাজে ব্যবসায়িক সংঘ, শ্রমিক সংগঠন এবং নিয়োগকারীদের সংগঠনকেও যুক্ত করা দরকার।

বিভিন্ন প্রকল্প	
প্রকল্পের নাম	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**
স্কুলছুটদের জন্য :	
১) কারিগর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	i) শিল্পের জন্য অর্ধদক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকের জোগান। ii) যুবসমাজের দক্ষতা বাড়িয়ে তাদের কাজের যোগ্য করে তোলা। এই প্রকল্প সরকার পরিচালিত ITI এবং বেসরকারি ITC-গুলির মাধ্যমে রূপায়িত হয়।
২) শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	i) কেন্দ্রীয় শিক্ষানবিশি পরিষদের নির্দেশিকা অনুযায়ী শিক্ষানবিশদের পাঠ্যসূচি, প্রশিক্ষণের মেয়াদ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা। ii) শিল্পমহলের দক্ষ মানবসম্পদের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের যাবতীয় সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার দিকে নজর রাখা। শিক্ষানবিশ প্রোৎসাহন যোজনা শুরু হয়েছে। এর আওতায় ১ লক্ষ শিক্ষানবিশের প্রথম ২ বছরের বৃত্তির অর্ধেক খরচ বহন করবে সরকার।
৩) TRIFED—হস্তশিল্পের দক্ষতা উন্নয়ন ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি	TRIFED হল ভারতের সরকারের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীন জাতীয় স্তরের একটি সমবায় সংস্থা। আদিবাসীদের তৈরি হস্তশিল্পের উন্নয়নে ও বিপণনে এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদিবাসীদের দক্ষতার বিকাশে সচেষ্ট এটি। এর উদ্যোগে আদিবাসী শিল্পীদের বস্ত্রবয়ন, হস্তশিল্প, চিত্রকলা প্রভৃতির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
মহিলা ও বয়ঃসন্ধির কিশোরীদের জন্য :	
৪) প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে সহায়তা (STEP)	i) মহিলাদের দক্ষতার বিকাশসাধন করে তাঁদের কাজ পাবার উপযুক্ত করে তোলা। ii) মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা, তাঁদের উদ্যোক্তা হিসাবে গড়ে তোলা।
৫) প্রিয়দর্শিনী প্রকল্প	এর আওতায় ১,০৮,০০০ দরিদ্র মহিলা ও কিশোরীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ৭২০০টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের চারটি সহ ৬টি জেলায় এই প্রকল্পের সূচনা হয়।
৬) স্বধর গৃহ/স্বল্পকালীন আবাস (পুনর্বাসন ও দক্ষতার বিকাশ)	এর আওতায় দেশের প্রতিটি জেলায় ৩০ জন মহিলা থাকতে পারেন এমন স্বল্পকালীন আবাস গড়ে তোলা হবে। এর লক্ষ্য হল : i) সামাজিক ও আর্থিক সম্বল নেই, এমন মহিলাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া। ii) তাঁদের মনের জোর ফিরিয়ে আনা। iii) পরিবার ও সমাজে তাঁরা যাতে মর্যাদার সঙ্গে থাকতে পারেন সে জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা। iv) তাঁদের অর্থনৈতিক ও মানসিক পুনর্বাসন।
৭) সবলা—কিশোরীদের ক্ষমতায়ণের জন্য রাজীব গান্ধী প্রকল্প	এর উদ্দেশ্য হল ১১-১৮ বছর বয়সসীমায় থাকা কিশোরীদের পুষ্টিগত চাহিদা পূরণ এবং যথাযথ স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা করা। এর পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা। ২০১০ সালের নভেম্বরে ভারত সরকার এই প্রকল্প শুরু করে। পরিবার কল্যাণ, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং স্কুলছুট মেয়েদের ফের শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আনাও এর উদ্দেশ্য।
৮) ২০০টি সীমান্তবর্তী/আদিবাসী অধ্যুষিত/ অনগ্রসর জেলায় মহিলাদের দক্ষতার বিকাশে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	সীমান্তবর্তী বা আদিবাসী অধ্যুষিত বা অনগ্রসর জেলাগুলিতে মহিলাদের দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে তাদের স্বনির্ভর করে তোলা।

বিভিন্ন প্রকল্প	
প্রকল্পের নাম	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**
গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের জন্য :	
৯) পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা (আগের নাম আজীবিকা)	২০১৭ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ গ্রামীণ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষিত করে তোলা। এই প্রশিক্ষণ হবে বিশ্বমানের, যা প্রধানমন্ত্রীর মেক ইন ইন্ডিয়া প্রচারাভিযানের পরিপূরক। এর আওতায় ভিন্নভাবে সক্ষমদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গ্রামের যুবকদের দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিতে আনা হবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদেশি প্রশিক্ষকদের।
১০) গ্রামীণ স্বনিযুক্তি ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প (RSETI)	যুব সম্প্রদায়ের বেকারত্বের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে গ্রামীণ স্বনিযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে পরিচালিত এই কেন্দ্রগুলি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের দক্ষতার বিকাশ এবং বিভিন্ন পেশায় তাদের সম্মানজনক নিযুক্তির ব্যবস্থা করা এর লক্ষ্য। প্রশিক্ষিত যুবক-যুবতীরা ব্যবসা করতে চাইলে এই কেন্দ্রগুলি অর্থের জোগানেও সাহায্য করে।
শহরের দরিদ্র মানুষের জন্য :	
১১) জাতীয় নাগরিক জীবিকা মিশন (NULM)	i) সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্পমহল, কারিগরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিল্পমহল অনুমোদিত শংসাপত্র প্রদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। ii) শহরাঞ্চলে দক্ষতার ঘাটতি বিশ্লেষণ করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষণ। iii) প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের ব্যক্তিত্ব গঠন ও তাদের মধ্যে পেশাদারি মনোভাবের সঞ্চার।
সংখ্যালঘু যুব সম্প্রদায়ের জন্য :	
১২) বহুক্ষেত্রিক উন্নয়ন কর্মসূচি (MSDP)	সংখ্যালঘুদের জীবনযাত্রা ও আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন। তাদের কাছে মৌলিক পরিষেবাগুলি পৌঁছে দেওয়া। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে অসাম্য দূর করা।
১৩) শিখো আউর কামাও (শেখো আর রোজগার করো)	i) সংখ্যালঘুদের বেকারত্বের হার কমানো। ii) সংখ্যালঘুদের ঐতিহ্যবাহী দক্ষতার সংরক্ষণ এবং বাজারের সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপন। iii) শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা বাড়ানো, স্কুলছুটদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা। iv) সংখ্যালঘুদের জীবিকার উন্নয়ন সাধন এবং তাদের মূল ধারার সঙ্গে যুক্ত করা। v) দেশের সম্ভাব্য মানব সম্পদের পরিচর্যা।
১৪) পারভাজ	দারিদ্রসীমার নীচে থাকা সংখ্যালঘু তরুণ-তরুণীদের জন্য শিক্ষা, দক্ষতার বিকাশ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
জম্মু-কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায়ের জন্য :	
১৫) হিমায়ত	কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত এই দক্ষতা বিকাশ প্রকল্পের আওতায় আগামী ৫ বছরের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরের ১ লক্ষ তরুণ-তরুণীদের আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। উচ্চমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম বেসরকারি সংস্থা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলিও এই প্রকল্পের সঙ্গে সংযুক্ত।
১৬) উড়ান	শিল্পমহলের এই বিশেষ প্রয়াসের লক্ষ্য হল জম্মু-কাশ্মীরের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর তরুণ-তরুণীরা। এদের আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে কাজের সুযোগ দেওয়া।

বিভিন্ন প্রকল্প	
প্রকল্পের নাম	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**
বাম উগ্রপন্থা প্রভাবিত এলাকার জন্য :	
১৭) রোশনি	দেশের ২৭টি বাম উগ্রপন্থা প্রভাবিত জেলায় এই কর্মসূচির আওতায় যুবসমাজকে দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে ৩, ৬, ৯ ও ১২ মাসের কার্যক্রম রয়েছে।
১৮) বাম উগ্রপন্থা প্রভাবিত ৩৪টি জেলায় দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি	এর আওতায় প্রতিটি জেলায় একটি করে ITI এবং দুটি করে দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এই কেন্দ্রগুলিতে চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জন্য :	
১৯) দক্ষতা বৃদ্ধি ও কারিগরি সহযোগিতা প্রকল্প (CBTA)	উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের নেওয়া এই প্রকল্পে সেখানকার বাসিন্দাদের দক্ষতার বিকাশ, কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে।
২০) উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও সিকিমে দক্ষতা বিকাশ পরিকাঠামোর উন্নয়ন	এর আওতায় উত্তর পূর্বাঞ্চল ও সিকিমে ২০টি ITI-এর উন্নয়ন এবং ২৮টি ITI-এর পরিকাঠামোগত ঘাটতি দূর করা হবে।
তপশিলি জাতি ও উপজাতিভুক্তদের জন্য :	
২১) তপশিলি জাতি সংক্রান্ত উপ-পরিকল্পনায় বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা	এর মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্রসীমার নীচে থাকা তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষজনের পরিবারমুখী অর্থনৈতিক প্রয়াসের উন্নয়ন। এই প্রয়াসগুলিকে উৎসাহ দিতে প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ, এগুলিকে বাজার উপযোগী করে তোলা। অঞ্চলভেদে পেশার ধরন ও অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রকৃতি ভিন্ন হয় বলে এই প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ নমনীয়তা রয়েছে।
২২) জাতীয় তপশিলি উপজাতি অর্থ ও উন্নয়ন নিগম	দক্ষতার বিকাশ ও স্বনিযুক্তির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা।
ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য :	
২৩) প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক পুনর্বাসন কেন্দ্র (VRC)	ভিন্নভাবে সক্ষমদের অর্থনৈতিক মূলস্রোতে সংযুক্ত করা। বর্তমানে দেশের নানা প্রান্তে এমন ২০টি কেন্দ্র আছে। এর মধ্যে ৭টি কেন্দ্রে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কর্মশালার ব্যবস্থা রয়েছে।
২৪) প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি	আলি ইয়াবর জঙ্গ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর দ্য হিয়ারিং হ্যান্ডিক্যাপড (AYJNIHH), পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় ইনস্টিটিউট ফর ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ মেন্টালি হ্যান্ডিক্যাপড (NIMH), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ভিসুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড (NIVH), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এমপাওয়ারমেন্ট অফ পার্সনস উইথ মাল্টিপল ডিসএবিলিটিজ (NIEPMD), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর অর্থোপেডিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড (NIOH), স্বামী বিবেকানন্দ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ রিহ্যাবিলিটেশন ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ (SVNIRTAR), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল ডিফেন্স (NISD), নানা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং স্নাতকস্তরের পাঠক্রম পরিচালনা করে।
উদ্যোক্তাদের জন্য :	
২৫) স্বনিযুক্তি কর্মসূচি (SEP)	৩ থেকে ৭ দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে উদ্যোগ স্থাপন, তার পরিচালনার কলাকৌশল শেখানো। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনার দায়িত্ব থাকে গ্রামীণ স্বনিযুক্তি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির ওপর।
২৬) উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রকল্প	যুব সম্প্রদায়কে শিল্পস্থাপন ও পরিচালনায় উৎসাহ দিতে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সাধারণত এর আয়োজন করা হয় ITI, পলিটেকনিক ও অন্য কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলিতে।

বিভিন্ন প্রকল্প	
প্রকল্পের নাম	**প্রকল্পের উদ্দেশ্য**
আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে অনগ্রসরদের জন্য :	
২৭) বয়স্ক শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সাহায্য প্রকল্পের আওতায় জন শিক্ষণ সংস্থান	নিরক্ষর, স্বল্পশিক্ষিত ও স্কুলছুটদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিতে জন শিক্ষণ সংস্থানগুলি চালু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল— i) বৃত্তিমূলক শিক্ষার যথাযথ পাঠ্যসূচি প্রণয়ন এবং এই সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো। ii) বয়স্ক শিক্ষা নির্দেশনালয়, জাতীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠান এবং কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত মহানির্দেশকের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। iii) উপযুক্ত মানবসম্পদ, পরিকাঠামো ও প্রশিক্ষণের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা। iv) পরীক্ষা নেওয়া ও শংসাপত্র প্রদান। v) প্রশিক্ষিতরা যাতে কাজ পান সেজন্য নিয়োগকর্তা ও শিল্পমহলের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

দুর্গম এলাকায় সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা : 'উড়ান', 'হিমায়াত', 'পারভাস', 'নই রশনি', 'স্টেপ আপ'-এর মতো সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলি যুব সম্প্রদায়কে কাজ পাবার যোগ্য করে তুলবে। পাহাড়ি এলাকা, জঙ্গি অধ্যুষিত এলাকায় এই কর্মসূচিগুলির প্রসার আরও বাড়াতে হবে। কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অসরকারি সংগঠন, নাগরিক সমাজ প্রভৃতিকেও।

সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ : নিয়োগের জন্য কেমন দক্ষতা প্রয়োজন, তা স্থির করতে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের, বিশেষত নিয়োগকর্তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয়। কার্যক্রমের প্রণয়ন, রূপায়ণ ও নজরদারি—সব স্তরেই তাদের যুক্ত থাকতে হবে। প্রশিক্ষণের জন্য আবেদনপত্র বাছাই, স্কুল ও শিল্পমহলের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানো, প্রশিক্ষণের মানের ওপর নজরদারি, অর্থের জোগান, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠন একযোগে কাজ করতে পারে।

অন্যান্য ব্যবস্থা : কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে বহু সরকারি দপ্তর নির্দিষ্ট কর্মসূচি রূপায়ণে তৎপর। এর ফলে অনেক সময়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং যথাযথ ফল মিলছে না। এ জন্য আন্তঃমন্ত্রক সমন্বয় গড়ে তোলা দরকার। দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে দ্রুত এগোতে প্রয়োজন সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব। এতে গোটা প্রক্রিয়ার দক্ষতা আরও বাড়বে এবং তা প্রসারিত হবে। সরকার বিনিয়োগ এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দিতে পারে, বেসরকারি সংস্থাগুলি ব্যবস্থা করতে পারে কর্মস্থলে প্রশিক্ষণের।

দক্ষতার বিকাশ, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। তবে এ জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উচ্চমান সুনিশ্চিত করতে হবে, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ফলাফলের ওপর। ❑

[লেখক নীতি আয়োগের উপদেষ্টা।
email : sunitasanghi1960@gmail.com]

উল্লেখপঞ্জী :

(১) Skills for Employability, Policy Brief ILO.
(২) Of total 25.9 crore children about 3.9% are either wring or have worked for some time in the labour market. In addition .6% who are marginal worker category and seeking work. There are about 1.57 percent who are non worker but seeking work in the labour market. In addition there are 3 percent children who are neither active in labour market nor in educational institution but are potential child labour.
(৩) Improving Skills and productivity of disadvantaged group (David H Freedmen, 2008).
(৪) Employment and unemployment Survey 2011-12.
(৫) Employment and unemployment Survey 2011-12.
(৬) Department of Disability Affairs, GOI.
(৭) Youth Unemployment in India, CII Economy Matters.
(৮) Improving Skills and Productivity of the Disadvantaged, ILO working paper.
(৯) Rajiv Gandhi National Fellowship for Higher education in India, National Overseas scholarship, Pre and Post metrics Scholarship; Maulana Azad National Fellowship for Minority Students etc.
(১০) ILO Policy Brief.

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

দক্ষ ভারতের লক্ষ্যে

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বিচার করলে দারিদ্রই ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে প্রয়োজন কর্মসংস্থান। প্রয়োজন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুদক্ষ কর্মীবাহিনী গড়ে তোলা। আর এই ক্ষেত্রেই উঠে আসে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গটা। আলোচনা করছেন **শান্তনু পালধি।**

বয়সের দিক থেকে দেখলে ভারতের জনসংখ্যার যে গঠন, গত চার দশকে তার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম (SRS 2013)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭১ থেকে ২০১৩-র মধ্যে ০-৪ বছর বয়সের শিশুদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। মোট জনসংখ্যার মধ্যে ০-৪ বছর বয়সের শিশুদের অনুপাত ১৯৭১-এ ৪১.২ শতাংশ থেকে কমে ১৯৮১-তে ৩৮.১ শতাংশ এবং ১৯৯১-এ ৩৬.৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১৩-তে ২৮.৪ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে, ১৫-৫৯ বছর বয়সের ব্যক্তি যাঁদের আমরা অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় জনগণ হিসাবে দেখি, মোট জনসংখ্যার মধ্যে তাঁদের অনুপাত ১৯৭১-এ ৫৩.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯৮১-তে ৫৬.৩ শতাংশ এবং ১৯৯১-এ ৫৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৩-তে ৬৩.৩ শতাংশে পৌঁছেছে। বয়সের দিক থেকে দেখলে ভারতের জনসংখ্যার যে গঠন, এটাই তার সুবিধার দিকটিকে তুলে ধরে।

স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন বা কৌশল বিকাশ যোজনার রূপায়ণ সংক্রান্ত বিবরণীতেও বলা হয়েছে, দেশের জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশের বয়স ২৫-এর নীচে। বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে জনসংখ্যায় যুবকদের অনুপাত ভারতেই সবচেয়ে বেশি। ভারতের জনসংখ্যা নিয়ে আগাম হিসাব (প্রোজেকশান) অনুসারে, ২০২০ নাগাদ ভারতীয় জনতার গড় বয়স দাঁড়াবে ২৯ বছর। সেই সময় গড় বয়স হবে, চীনে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৭ বছর, পশ্চিম ইউরোপে ৪৫ বছর আর জাপানে ৪৮ বছর। ফলে, বিশ্ব অর্থনীতিতে ২০২০ নাগাদ যখন চাহিদার তুলনায় যুব জনতার ঘাটতি ৫ কোটি ৬০ লক্ষে পৌঁছবে, তখন ভারত হবে একমাত্র দেশ যেখানে উদ্বৃত্ত যুববয়সিদের সংখ্যা হবে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ। আবার ২০২১ পর্যন্ত ভারতে শ্রমিকদের বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হবে। ভারতীয় শ্রম প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২৫ নাগাদ ৩০ কোটি যুবক-যুবতী নতুন শ্রমশক্তি (work force) হিসাবে যুক্ত হবেন। আর আগামী ৩ বছরে বিশ্বে প্রতি ৪ জন শ্রমিক-কর্মচারীর মধ্যে ১ জন হবেন ভারতীয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, স্পষ্টই বোঝা যায় যে শুধু দেশে কর্মসংস্থান করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। একদিকে ভারতে শ্রম শক্তি বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হওয়ার সমস্যা থাকবে। আবার ভারতের বাইরের দেশগুলিতে ঐসব দেশের জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক গঠনগত বৈশিষ্ট্য যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, শ্রমের চাহিদার তুলনায় জোগানে যে ঘাটতি দেখা দেবে, সেই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে ভারত একটা ভূমিকা নিতে পারবে। ঐ অবস্থার সুবিধা নিতে পারলে ভারতের শ্রমশক্তি আন্তর্জাতিক বাজারে আরও বৃহত্তর স্থান অধিকার করতে সক্ষম হবে।

ঠিক এই জায়গাতেই, ভারতের শ্রমশক্তির নিয়োগযোগ্যতাকে বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথাটা উঠে আসে। উৎকৃষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকশিত জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর নিয়োগযোগ্যতার বিষয়টি নির্ভর করে। তাই কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানে সুপরিকল্পিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

দেশের যুবক-যুবতীদের দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেবার লক্ষ্যে অন্যতম প্রধান উপায় হিসেবে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার কথা ভাবা হয়েছে। এর মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে উপার্জনক্ষম করে তোলা এবং তারা যাতে দেশের দারিদ্র দূরীকরণ প্রয়াসকে সাহায্য করতে পারে সেটা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম (NSDC) প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনাকে রূপায়িত করবে। দেশের প্রায় ২৪ লক্ষ যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন পেশায়, বিভিন্ন ভাবে দক্ষ করে তোলা হবে এই কর্মসূচিতে। দশম শ্রেণি, দ্বাদশ শ্রেণিতে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে এমন ছেলেমেয়ে এবং স্বল্প আয়সম্পন্ন পরিবারগুলির ছেলেমেয়েদের এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে।

২০২০ সাল নাগাদ পঞ্চাশ কোটি যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া ও তাদের মধ্যে দক্ষতার বিকাশ ঘটানো দক্ষ ভারত কর্মসূচির লক্ষ্য।

এমন নয়, এতদিন পর্যন্ত দেশে দক্ষতার বিকাশে কোনও কর্মসূচি ছিল না। তাহলে 'দক্ষ ভারত' (স্কিল ইন্ডিয়া) এই কর্মসূচির বিশেষত্ব কোথায়? প্রথমত, পূর্ববর্তী দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচিগুলিকে জোর দেওয়া হত চিরাচরিত কাজের ওপর। কিন্তু এবার সব রকমের কাজের ওপর সমানভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে। চিরাচরিত পেশা, কাঠের কাজ, জুতো তৈরী, ওয়েল্ডিং-এ এবং কর্মকার, রাজমিস্ত্রি, নার্স, দর্জি, তন্তুবায়েদের কাজে প্রশিক্ষণ সহায়তা পরামর্শদানের ব্যবস্থা যেমন থাকবে, তেমন নতুন নতুন ক্ষেত্র যেমন, রিয়াল এস্টেট বা জমি-বাড়ি নির্মাণ, পরিবহণ, বয়নশিল্প, রত্নালংকার শিল্প, জুয়েলারি ডিজাইনিং, ব্যাংকিং, পর্যটন ও অন্যান্য নানা ক্ষেত্র যেখানে দক্ষতার বিকাশ পর্যাপ্ত নয় বা একেবারেই হয়নি সেগুলির ওপর আরও বেশি জোর দেওয়া হবে। দ্বিতীয়ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি হবে আন্তর্জাতিক স্তরের যাতে আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অন্যান্য দেশ যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, জার্মানি, রাশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির দক্ষ শ্রমশক্তির চহিদাও পূরণ করতে পারে।

তৃতীয়ত নির্দিষ্ট বিভিন্ন বয়ঃসীমার ছেলেমেয়েদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক উপযুক্ত কর্মসূচিও চালু করা হবে। এগুলির কাজ নিয়োগযোগ্যতা সংক্রান্ত দক্ষতা-সহ ভাষা ও যোগোযোগের ক্ষেত্রে দক্ষতা, জীবন ও সদর্থক চিন্তনের দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনগত দক্ষতা, আচরণগত দক্ষতার বিকাশ ঘটানো। চতুর্থত, দক্ষ ভারত বা স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গ্রামীণ ভারতের দক্ষতা ক্ষেত্রে একটি উচ্চতর মান সৃষ্টি করা।

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। প্রধানমন্ত্রী কৌশলে বিকাশ যোজনা কর্মসূচিতে যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের নিয়োগযোগ্য করে তোলার পাশাপাশি, তাদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার ক্ষমতাকেও (অন্ত্রপ্রেনরশিপ) বিকশিত করা হবে। জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম (NSDC) তার প্রশিক্ষণ সহযোগীদের মাধ্যমে এই কর্মসূচি রূপায়িত করবে। ১৮৭টি প্রশিক্ষণ সহযোগী সংস্থার দেশ জুড়ে ২৩০০-রও বেশি কেন্দ্র রয়েছে, এছাড়াও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অনুমোদিত প্রশিক্ষণ দাতা সংস্থাগুলিকেও প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায় প্রশিক্ষণ দেবার কাজে লাগানো হবে। এই কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণদাতাদের অংশগ্রহণ করতে দেবার আগে তাদের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের বিষয়টি ভালোভাবে যাচাই করে দেখা হবে। সেক্টর স্কিল কাউন্সিল বা ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতা বিষয়ক পরিষদ ও বিভিন্ন রাজ্য সরকার, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় যেসব দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ চলবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদারকি করবে। পাশাপাশি যুবক-যুবতীরা যাতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও শিল্প পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক অবহিত থাকতে পারে সেজন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও পাঠক্রমের নিরন্তর পরিমার্জন চলতে থাকবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পর্কে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের উপলব্ধি ও মূল্যায়নকেও সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

স্কিল ইন্ডিয়া মিশন বা দক্ষ ভারত অভিযানের লক্ষ্যই হচ্ছে দেশে সুপ্রশিক্ষিত এক শ্রমিকবাহিনী গড়ে তোলা। আমাদের দেশে সুপ্রশিক্ষিত দক্ষ শ্রমিকদের ঘাটতি বিরাট। হিসাব করে দেখা গেছে ভারতে শ্রমশক্তির ২.৩ শতাংশ প্রথাগত দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

এই হার, ব্রিটেনে ৬৮ শতাংশ, জার্মানিতে ৭৫ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৫২ শতাংশ, জাপানে ৮০ শতাংশ ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ৯৬ শতাংশ। ভারতে শিক্ষিত শ্রমশক্তির একটা বিরাট অংশের নিজেদের পেশায় অত্যন্ত সামান্য দক্ষতা আছে বা একেবারেই নেই। এর ফলে তাদের নিয়োগযোগ্যতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়। তাই নিয়োগ কর্তাদের চাহিদা মেটানো এবং অর্থনৈতিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রয়াসকে জোর দিতেই হবে। সর্বভারতীয় স্তরে ভারতে ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের লোকেদের মাত্র ৬.৮ শতাংশ বৃত্তিমুখী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বা নিচ্ছেন।

জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম (NSDC) যে সমীক্ষা চালিয়েছে তাতে দেখা গেছে ২০১৩ থেকে ২০২২-এর মধ্যে অকৃষি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১২ কোটি দক্ষ লোকের প্রয়োজন হবে। বর্তমানে দেশে দক্ষতা বিকাশের যে ক্ষমতা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয় বলেই চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে দ্রুততার সঙ্গে তাকে বাড়িয়ে তোলা জরুরি।

আমাদের দেশে শ্রমশক্তির দক্ষতার মান কম হওয়ার বেশ কিছু কারণও রয়েছে। প্রথমত, দেশে প্রথাগত বৃত্তিমুখী শিক্ষার কাঠামোই পর্যাপ্ত নয়। এবং তার বহুরকম অসম্পূর্ণতাও রয়েছে। বৃত্তিমুখী শিক্ষা যেসব প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয় সেগুলির মানে যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, দক্ষতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার সামর্থ্যেও ঘাটতি রয়েছে এইসব প্রতিষ্ঠানের। তৃতীয়ত, হাই স্কুল পর্যায়ে যারা স্কুলছুট হচ্ছে তাদের ঠিকঠিকভাবে বৃত্তিমুখী বা পেশাগত দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির আওতায় বহুলাংশে আনা যায়নি। উচ্চতর শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা কম সংখ্যায় যাওয়ার ফলে, স্কুলছুটের সংখ্যা বাড়ে, বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চপ্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। এতে পিরামিডের একেবারে নীচের তলায় ভীড় বাড়ে কম শিক্ষিত ও কম দক্ষ লোকেদের। তৃতীয়ত, দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও অনেক নেতিবাচক ভাবনা-চিন্তার শিকার আমরা। সর্বোপরি, পেশাদারি পাঠক্রমগুলিও শিল্পের জন্য পরিপূর্ণভাবে তৈরি করে দেবার মতো দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারছে না। দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি হিসাবে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, চাহিদার ভিত্তিতে দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে চালানো হবে। জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম (NSDC) ২০১৩-১৭ এই সময়ে, দক্ষতার চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ঘাটতির বিষয়ে সমীক্ষা চালিয়েছে। তার ভিত্তিতেই চাহিদার পরিমাণ নির্ধারিত হচ্ছে। চাহিদা নির্ণয়ের লক্ষ্যে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয় ও বিভাগের চাহিদা, রাজ্য সরকারগুলির চাহিদা, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের চাহিদা জানতে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। আবার সাম্প্রতিক সময়ে চালু হওয়া বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি যেমন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া', 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', জাতীয় সৌর মিশন, স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো কর্মসূচিগুলি বাবদ যে চাহিদা, তা পূরণের লক্ষ্যে দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যমাত্রাও স্থির করা হয়েছে।

ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতা পরিষদ শিল্পসংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে, ঠিক কী ধরনের দক্ষতা গড়ে তোলা প্রয়োজন, সে সংক্রান্ত ধারণা ও প্রক্রিয়া, নির্ণয় এবং সার্টিফিকেশন ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের স্বীকৃতির জন্য দরকারি কাজ করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট শিল্পের কোনও বিশেষ কাজের পক্ষে কোন জাতীয় পেশাগত মান (NOS) ও 'কোয়ালিফিকেশন প্যাক্স' বা জাতীয় পেশাগত মান ও যোগ্যতাবলী একজন শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে এ সব পরিষদ তা সুপারিশ করবে এবং দেখাবে তা জাতীয় দক্ষতা বিষয়ক যোগ্যতা কাঠামো (NSQF)-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে কি না। এইভাবে, দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে শিল্পের চাহিদার অনুসারী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনাতে।

উৎকৃষ্ট ও দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশের শিল্প প্রশিক্ষণ সংস্থা (ITI)-গুলির যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকতে চলেছে, তা অনস্বীকার্য। দক্ষতা বিকাশ মিশনের সূচনা লগ্নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও এ বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, বিশ শতকে দেশের IIT-গুলি সারা বিশ্বে নাম করেছিল। এখন একবিংশ শতাব্দীতে ITI-গুলিকে উৎকৃষ্ট

ও দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তুলে বিশ্বজুড়ে নাম করতে হবে।

১৯৫০-এর দশকে, দেশে শিল্পের বিকাশে দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা মেটাতে, বিভিন্ন বৃত্তিমুখী পেশায় দক্ষতার প্রশিক্ষণ দিতে প্রায় ৫০টি সরকারি ITI গড়ে তোলা হয়েছিল ১৯৮০-র দশকে, দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্য, বিশেষ করে কেরালা, কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশে বেশকিছু বেসরকারি ITI গড়ে ওঠে। এইসব রাজ্য থেকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষিত কারিগররা পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কাজ করার ডাকও পান।

বিগত দুদশকে, দেশে সরকারি ও বেসরকারি ITI-গুলির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত পাঁচ বছরে ITI-গুলির সংখ্যা বাড়ছে বছরে ১৫ শতাংশ হারে। দেশে বর্তমানে ITI-এর সংখ্যা ১২০০০-এর মতো, যেখানে প্রায় ১৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণ নিতে পারছে। গত বছর সেপ্টেম্বরের গোড়ায় পশ্চিমবঙ্গে ৫২টি সরকারি ও ৬২টি বেসরকারি ITI ছিল। এগুলিতে ছাত্রছাত্রী প্রশিক্ষণের ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ১৩৯৯৬ ও ৭৬৮৮।

পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশে ITI-এর বর্তমান সংখ্যা ও সেগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেবার ক্ষমতা আরও বাড়ানো দরকার। দরকার সেগুলির উৎকর্ষ ও মানকেও বাড়ানো। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা এই প্রয়োজনের দিকেও দৃষ্টি দেবে। আবার একইসঙ্গে দক্ষ ভারত কর্মসূচি ২০২০ সাল নাগাদ দেশের ৫০ কোটি যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের দক্ষতা বিকাশের যে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন তাতে প্রতিটি গ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফলে এমনটা আশা করাই যায়, প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ একেবারে তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ফলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য পরিষেবা ক্ষেত্রের জন্য দক্ষ শ্রমশক্তির জোগান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। গ্রামাঞ্চলে যুবক-যুবতীদের জন্য দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে উঠে এসেছে। এই কর্মসূচিতে দক্ষতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের নিয়োগের বিষয়টিকেও যুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে নভেম্বর মাস পর্যন্ত DDUGKY-এর আওতায় ৫২০০০-এর মতো যুবক-যুবতীকে দক্ষতা অর্জনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রায় ২৯০০০ জনের কর্মসংস্থানও হয়েছে। দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে দক্ষ শ্রমশক্তির চাহিদা পূরণে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের দক্ষতা অর্জন সংক্রান্ত কর্মসূচির ওপর নতুন করে গুরুত্ব দিয়ে ও তার অগ্রাধিকারগুলিকে পুনর্নির্ধারণ করে তাদের কর্মক্ষমতাকে আরও বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায়, পূর্ব অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা ও কর্মকুশলতা রয়েছে এমন প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই মূল্যায়নে অংশ নেবার জন্য তাঁদেরও আর্থিক পারিতোষিক দেওয়া হবে। প্রথাবহির্ভূত ক্ষেত্রে (ইনফর্মাল সেক্টর) কর্মরত শ্রমিকদের অর্জিত দক্ষতাকে স্বীকৃতি প্রদান ও তাঁদের কর্মসূচিতে নিয়ে আসার লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বর্তমান শ্রমশক্তির দক্ষতার মানকে উন্নত করা ও তাকে পুনরায় দক্ষ করে তোলার প্রক্রিয়ার পক্ষেও এই ব্যবস্থা যথেষ্ট সহায়ক হবে। পূর্ব জ্ঞানের স্বীকৃতি প্রদান (RPL)-এ সেই সব কাজ ও ক্ষেত্রকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে, যেখানে সেটা সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত বলে বিবেচিত হবে।

চিরাচরিত শিল্প এবং হস্তশিল্পে দক্ষতার সংরক্ষণ ও তার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আরও একটি বিরাট প্রকল্পেরও সূচনা হয়েছে। USTAAD (আপগ্রেডেশন অব স্কিলস্ অ্যাণ্ড ট্রেনিং ইন অ্যানসেস্ট্রাল আর্টস/ক্রাফ্টস ফর ডেভেলপমেন্ট)—নামাঙ্কিত এই কর্মসূচিতে বংশানুক্রমিকভাবে কারিগর, এমন হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। এ বছর মে মাসে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে এই কর্মসূচির সূচনা করেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘুবিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী নাজমা হেপতুল্লা। ১৭ কোটি টাকার এই উদ্যোগ চিরাচরিত পারস্পরিক দক্ষতার সংরক্ষণ ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্পী ও কারিগরদের তৈরি পণ্যের বাজারকে আরও প্রসারিত করার বিষয়টিকেও সুনিশ্চিত করবে।

চিরাচরিত হস্তশিল্প ও কারিগরি সৌকর্যের কারণে বিশ্বে ভারতের এক বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে দক্ষতা সঞ্চারিত হওয়ার ফলে, ভারতীয় হস্তশিল্প ও হস্তচালিত তাঁতবস্ত্র বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছেছে। নকশা, উৎকর্ষ ও উন্নততর কারিগরি সৌকর্যের ভিত্তিতে এই সব পণ্যের জন্য বিশ্বের বাজারে একটি বিশেষ স্থান তৈরি হয়েছে।

আধুনিক প্রযুক্তি ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, দেশের বংশানুক্রমিক তন্তুবায়রা, যন্ত্রচালিত ক্ষেত্রের কাছ থেকে প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। কারণ, যন্ত্রচালিত ক্ষেত্র কম খরচে বিপুল পরিমাণ তন্তু উৎপাদন করছে। যুব প্রজন্মও দক্ষতা অর্জন করতে অথবা পারিবারিক ঐতিহ্য বা পারম্পর্য বজায় রাখতে ইচ্ছুক নয়। ফলে, বহু প্রজন্ম ধরে হস্তশিল্পের সঙ্গে যুক্ত পরিবারগুলি আর এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

আগেকার দিনে, সুদক্ষ হস্তশিল্পী বা কারিগরদের রাজা, জমিদার ও শাসনকর্তারা সম্মানিত করতেন, আর্থিকভাবে উৎসাহিত করতেন এবং বিশেষ সুযোগসুবিধা দিতেন। সময় বদলের সঙ্গে সঙ্গে চিরাচরিত বা পরম্পরাগত দক্ষতা-নির্ভর পেশায় যুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমেছে, বেড়েছে আর্থিক দুরবস্থা। চিরাচরিত পারিবারিক দক্ষতা-নির্ভর পেশায় যুক্ত থাকার ব্যাপারে যে যে মূল কারণে যুব প্রজন্মের অনীহা, এটি তার অন্যতম। যুব প্রজন্মের অন্য কাজে চলে যাওয়া আটকাতে সরকার USTAAD কর্মসূচি চালু করেছেন। চিরাচরিত দক্ষতার আরও বিকাশ ঘটিয়ে, সুযোগ সৃষ্টি করে এবং তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারকে আরও প্রসারিত করতে বেশি করে সহায়তা দিয়ে USTAAD এই লক্ষ্য অর্জনের কাজ চালিয়ে যাবে। আশা করা যায়, ভারতের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের সংরক্ষণ ও প্রসারের সঙ্গে যুক্ত সকলের সমর্থন ও অংশগ্রহণ USTAAD কর্মসূচিকে সাফল্য এনে দেবে।

ভারতে শ্রমশক্তির একটা খুব ছোট অংশ প্রথাগতভাবে দক্ষতার প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। তাই স্বাভাবিক কারণেই, দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্র, শিল্প, বাণিজ্য, পরিষেবা তাদের উৎপাদন ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে গিয়ে দক্ষ লোকেদের এক বিরাট ঘাটতির মুখোমুখি হয়। আবার, শ্রমশক্তির

উৎকর্ষে ঘাটতি উৎপাদনশীলতাকে নীচুস্তরে আটকে রাখে। অন্যদিক থেকে, দেশের যুব সম্প্রদায় অর্থনৈতিক ও জীবিকার সুযোগ পেতে চায়। এই প্রেক্ষিতেই, দক্ষতার বিকাশ দেশের অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে, এক বিশেষ স্থান দাবি করে। দক্ষতার বিকাশ শুধু যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন, তাই নয়। যুব সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। মনে রাখতে হবে, যুবসমাজ চান উন্নত মানের উন্নত বেতনের কাজ এবং স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ। বয়সের দিক থেকে জনসংখ্যার গঠনগত যে সুবিধা ভারতের রয়েছে, দক্ষতা বিকাশের উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে তাকেও আমরা কাজে লাগাতে পারব। দক্ষ মানুষদের এক বিপুল ভাণ্ডার, ভারতকে বিশ্বে, বিশেষ করে যেসব দেশে বয়স্ক মানুষদের অনুপাত ক্রমবর্ধমান, সেই সব দেশে দক্ষ শ্রমশক্তির জোগানদাতা হওয়ার সুযোগ এনে দেবে।

টেলিযোগাযোগের পরিষেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থাকে সহযোগী করে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। IVR-এর মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিশদ তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে শামিল হওয়ার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলে প্রার্থীদের তাঁদের নিকটবর্তী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কে বিশদে জানানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, প্রশিক্ষণের জন্য নির্ধারিত দিনে ওই কেন্দ্রে উপস্থিত হবার জন্য।

রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন ও সাংসদদের মাধ্যমেও কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রার্থীদের সমবেত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কর্মসূচির আওতায় আসতে পারেন। শিবিরভিত্তিক ব্যবস্থার কথাও ভাবা হয়েছে। কোন কোন কাজে দক্ষতা অর্জন বিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়া যেতে পারে, কর্মসংস্থান বা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে কীভাবে কতটা পেশায় উন্নতি করা যেতে পারে, দক্ষতাবিষয়ক প্রশিক্ষণের পর উপার্জনের সম্ভাবনা কতটা সেসব তথ্য জানাতে প্রতিটি জেলায় 'কৌশল মেলা' আয়োজনের ব্যবস্থাও রয়েছে। লোকসভার ৫৪৩টি সংসদীয় ক্ষেত্র যাতে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় আসে, তা সুনিশ্চিত করতে প্রয়াস চালানো হবে। দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এই কর্মসূচি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং দক্ষতার বিষয়টিকে সেখানকার মানুষদের কাছে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সরাসরি তুলে ধরতে 'দক্ষতা যাত্রা'-র আয়োজন করা হবে। এনজিও এবং জনসমষ্টিকে নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলিকেও এই ধরনের কাজে শামিল করা হবে, যাতে দেশের সর্বাধিক স্থানে কর্মসূচিটি পৌঁছে দেওয়া যায় এবং দক্ষতা অর্জনের অনুকূল একটি পরিবেশ রচিত হয়। গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও এই ধরনের প্রয়াস চলবে।

মনে রাখতে হবে, দক্ষতার বিকাশেও দু ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একদিকে, যে দক্ষতা অর্জন বা সৃষ্টি আমরা করব, তাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। অন্যদিকে, সৃষ্ট দক্ষতাকে যদি কাজে লাগানো না যায় তবে তা অপচয় বলেই পরিগণিত হবে।

আমাদের দেশে শ্রমশক্তি যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার তুলনায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার কম। জনগণনা অনুসারে ২০০১ থেকে ২০১১-র মধ্যে পুরুষ-মহিলা মিলিয়ে শ্রমশক্তির বৃদ্ধি হয়েছে ২.২৩ শতাংশ হারে। এই হার, একই দশকে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির যেসব হার বিভিন্ন হিসাবমতো পাওয়া গেছে, (প্রায় ১.৪ শতাংশের কাছাকাছি), তার তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। জনগণনা ও অর্থনৈতিক গণনা অনুযায়ী ১৯৯০-এর দশকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছিল ২ শতাংশ হারে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে, জনগণনা ও জাতীয় নমুনা সমীক্ষা, NSS, উভয়ের হিসাবেই কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার কমেছে। ঐ হার সীমিত রয়েছে ১.৪ থেকে ১.৮ শতাংশের মধ্যে।

কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা (অর্থাৎ মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বৃদ্ধির হারের তুলনায় কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হারের যে তুলনামূলক সম্পর্ক)-ও সে প্রবণতাকে নির্দেশ করে। ১৯৯০-এর দশকে, স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ ছিল ০.৩৫-০.৪৪, যা একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে কমে হয় ০.২। শ্রম ব্যুরোর সাম্প্রতিক তথ্য পরিসংখ্যান আভাস দিয়েছে, যে, ২০১১-১২ থেকেও কর্মসংস্থানের স্থিতিস্থাপকতা কমই রয়েছে। তাই কর্মসংস্থানের আরও সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি, এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে আমাদের অবশ্যই যথেষ্ট সাহায্য করবে, যদি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে দেশের যুবসমাজের ক্ষমতায়ন হয়, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাঁদের নিয়োগযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলা যায় এবং স্বনিযুক্তির জন্য তাঁদের মধ্যে উদ্যোগপতি হবার ক্ষমতাকে বিকশিত করা যায়।

জাতীয় দক্ষতা বিকাশ মিশনের সূচনালগ্নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন যে, আগামী দশকে ভারতে যে শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত হবে, তা ৪ থেকে ৫ কোটির মতো। এই যুবশক্তিকে, বিশ্বে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার উপযোগী দক্ষতা ও সক্ষমতা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছিলেন তিনি। সেটা করতে না পারলে ভারতের ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডই এর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেবে, সে ব্যাপারে সতর্কবার্তা উচ্চারণ করেছিলেন তিনি। এর সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে ভারতের এই সুবিধা বজায় থাকবে ২০৪০ পর্যন্ত। অর্থাৎ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সদ্ব্যবহার করা ও দক্ষতার ক্ষেত্রে দেশের ঘাটতি অবস্থাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য খুব বেশি সময় আমাদের হাতে নেই। দক্ষতা বিকাশ মিশন, প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা সম্পর্কে সচেতনতার সর্বাধিক প্রসার ঘটিয়ে, কর্মসূচির সুবিধা যুবসমাজের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দিয়ে, দশম, দ্বাদশ শ্রেণির স্কুলছুটদের তাঁদের উপযোগী দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণে শামিল করে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে। দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচির পূর্ণ ভৌগোলিক ব্যাপ্তি এবং কর্মসূচির সুবাদে প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা, দেশের প্রতিটি প্রান্তে শ্রমশক্তির দক্ষতা বিকাশকে ত্বরান্বিত ও সুনিশ্চিত করতে পারে। আমরা এতে কীভাবে সাড়া দিই, এর সুবিধা কতটা নিতে প্রস্তুত, তার ওপর আমাদের দেশের অর্থনীতির ভাবীরূপ অনেকাংশে নির্ভর করবে।❑

[লেখক প্রাক্তন অতিরিক্ত মহানির্দেশক, প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো, কলকাতা।]

গ্রামীণ জীবিকা বিকাশের লক্ষ্যে 'আনন্দধারা'

উপার্জন না হলে দারিদ্র বৃদ্ধি পাবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কর্মসংস্থান না থাকলে সাধারণ মানুষ রোজগার করার সুযোগই বা পাবে কীভাবে? কর্মসংস্থান বৃদ্ধি তথা দারিদ্র দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নানা সময়ে দেশের নানা প্রান্তে নানা প্রকল্প চালু হয়েছে। কিন্তু এই প্রেক্ষিতে দক্ষতা বৃদ্ধির গুরুত্বও অনস্বীকার্য। কারণ, মানুষকে কর্মোপযোগী না করে তুলতে পারলে দীর্ঘমেয়াদে গোটা প্রক্রিয়াটারই উৎপাদনশীলতা মার খাবে। এই নিবন্ধে **রাজকুমার লস্কর** *পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে বলবৎ 'আনন্দধারা'-র বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করছেন।*

স্বনিযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে '৯০-এর দশকের শুরুতে দেশ জুড়ে যে স্বনির্ভরগোষ্ঠী—ব্যাংক সংযোগ কর্মসূচি চালু হয়েছিল, আজ তা এক সামাজিক আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণে ও মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ১ এপ্রিল, ১৯৯৯ সালে গ্রামোন্নয়নে গৃহীত '৭০ ও '৮০-র দশকের ৬টি প্রকল্পকে একত্র করে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে চালু হয়েছিল 'স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা' বা SGSY। কিন্তু এই SGSY-এর কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আমরা পুরোপুরি অর্জন করতে পারিনি। তাই কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক ১ এপ্রিল, ২০১৩ সালে SGSY প্রকল্পটির পরিবর্তন ও সংশোধন করে চালু করে 'জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন' (NRLM)—জাতীয় স্তরে যা 'আজীবিকা' এবং পশ্চিমবঙ্গে 'আনন্দধারা' নামে চালু করা হয়েছে।

'আনন্দধারা' প্রকল্পের লক্ষ্য—

(১) গ্রামের গরিব মানুষের, এক কথায় মহিলাদের নিজস্ব দক্ষ ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা,

(২) প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে জীবিকা বিকাশ, এবং

(৩) আর্থিক পরিষেবা সহজলভ্য করে তোলার পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ও স্বত্বাধিকার সুনিশ্চিত করা।

এক কথায়, গ্রামের মানুষের এই সংগঠনগুলিকে একেবারে তৃণমূলস্তরে উন্নয়নের হাতিয়ার করে তোলা। পূর্বতন SGSY-এর সঙ্গে 'আনন্দধারা'-র পার্থক্য সারণি-১-এ আলোচনা করা হল।

সারণি-১
SGSY বনাম NRLM

স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা (SGSY)	আনন্দধারা (NRLM)
(১) বণ্টনভিত্তিক কর্মসূচি	(১) চাহিদাভিত্তিক কর্মসূচি
(২) প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দু মূলত গোষ্ঠী সদস্য	(২) এখানে কেন্দ্রবিন্দু স্বগোষ্ঠী সদস্যার পরিবার
(৩) মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষ ও মিশ্র স্বনির্ভরগোষ্ঠী	(৩) শুধুমাত্র মহিলা দল
(৪) সর্বোচ্চ ১,২৫,০০০ টাকা মূলধনি অনুদান	(৪) মূলধনি অনুদান বিলুপ্ত
(৫) সুদের উপর কোনও ভরতুকি ছিল না	(৫) সুদের উপর ভরতুকি প্রযোজ্য
(৬) মূলগত দলগত উদ্যোগে ব্যবসা/প্রকল্প	(৬) দলগত উদ্যোগের পাশাপাশি একক উদ্যোগে গুরুত্ব আরোপ
(৭) স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে উচ্চতর প্রতিষ্ঠান বা সংঘ (ক্লাস্টার) তৈরি করা হলেও তার নিবন্ধন বাধ্যতামূলক ছিল না	(৭) এখানে সংঘগুলিকে সমবায় আইনে নিবন্ধন করতে হবে। এক কথায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংঘগুলি মহিলা ব্যাংক রূপে কাজ করবে

'আনন্দধারা' প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য ও দিক

(ক) **সামাজিক সমবেতকরণ :** 'আনন্দধারা' প্রকল্পে দ্বাদশ পরিকল্পনার শেষে সমস্ত গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলিকে (BPL) স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মধ্যে আনতে হবে এবং ধীরে ধীরে তাঁদের সংঘে যুক্ত করতে হবে।

(খ) **পর্যায়ক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়ন :** 'আনন্দধারা' প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত জেলাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রথম ধাপে যেসব জেলা ও ব্লকে প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে সেগুলি 'ইনটেনসিভ ব্লক'-এর অন্তর্গত। এই সমস্ত ব্লকে অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং দক্ষ মানবসম্পদ নিয়োগ করে প্রকল্পের দিকগুলি রূপায়ণ করা হবে।

(গ) **চাহিদাভিত্তিক কর্মসূচি :** 'আনন্দধারা' বা NRLM প্রকল্পটি গতানুগতিক পদ্ধতির থেকে আলাদা করে একটি মিশন হিসেবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে চাহিদাভিত্তিক, অর্থাৎ প্রতিটি রাজ্য জেলার সঙ্গে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বা অ্যানুয়াল অ্যাকশান প্ল্যান (AAP) তৈরি করবে এবং এই পরিকল্পনায় প্রশাসনিক খরচের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজনগুলিও প্রতিফলিত হবে।

(ঘ) **সামাজিক সম্পদকর্মী :** 'আনন্দধারা' প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এক ঝাঁক দক্ষ ও প্রশিক্ষিত সামাজিক সম্পদকর্মী গড়ে তোলা। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (CSP), ব্যাংক মিত্র, বুককিপার, জীবিকা বিশেষজ্ঞ, সংঘ পরিচালক ইত্যাদি। এই সম্পদকর্মীরাই জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সুস্থায়িত্ব সুনিশ্চিত করতে পারে।

(ঙ) **'আনন্দধারা' প্রকল্প অনুসারে স্বনির্ভরগোষ্ঠী :** 'আনন্দধারা' বা NRLM প্রকল্পের বিভিন্ন পরিষেবা পেতে গেলে

গোষ্ঠীগুলিকে অবশ্যই কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে। শর্তগুলি হল—

- প্রতিটি স্বনির্ভরগোষ্ঠী শুধুমাত্র মহিলাদের নিয়েই গঠন করা হবে এবং মোট সদস্যার কমপক্ষে ৭০ শতাংশ BPL-পরিবারভুক্ত হওয়া চাই।
- প্রতিটি স্বনির্ভরগোষ্ঠী 'পঞ্চসূত্র' মেনে গোষ্ঠী পরিচালনা করবে। 'পঞ্চসূত্র' হল :

(অ) গোষ্ঠী পরিচালনায় নিয়মিত মিটিং এবং অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
(আ) নিয়মিত সঞ্চয়
(ই) দলীয় তহবিলের নিয়মিত ব্যবহার
(ঈ) ব্যাংক ঋণের নিয়মিত পরিশোধ, এবং
(ঋ) সঠিক হিসাবনিকাশ।

(চ) **আর্থিক সহায়তা :** 'আনন্দধারা' প্রকল্পে মহিলা স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির আর্থিক সহায়তা প্রদানের উৎসগুলি বিবিধ। এখানে গোষ্ঠীগুলি জীবিকা বিকাশের লক্ষ্যে আবর্তনীয় তহবিল, একাধিকবার ব্যাংক ঋণের সুবিধার পাশাপাশি মহিলা সংঘগুলিকে প্রকল্পের তহবিল থেকে অনুঘটক মূলধনরূপে 'কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড' (CIF) প্রদান করা হবে। ব্যাংক ঋণের পাশাপাশি গ্রামীণ মহিলারা তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান বা মহিলা ব্যাংক থেকে অল্প সুদে ঋণের সুবিধা পাবে।

(ছ) **সুদের উপর ভরতুকি :** 'আনন্দধারা' প্রকল্পে বর্তমানে কোনও মূলধনি অনুদান (ক্যাপিটাল সাবসিডি) নেই। গ্রামীণ মহিলা গোষ্ঠীকে শর্তসাপেক্ষে সুদের উপর ভরতুকি দেওয়া হবে। অর্থাৎ, গোষ্ঠীর সদস্যারা যদি নিয়মিতভাবে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করে তবে তাঁরা নির্দিষ্ট হারে সুদের উপর ভরতুকি পাবে। এই ভরতুকির হার হল ব্যাংক নির্ধারিত সুদের হার এবং ৭ শতাংশের মধ্যে ব্যবধানটুকু। তবে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, কোচবিহার ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় স্বনির্ভরগোষ্ঠী সরাসরি বার্ষিক ৭ শতাংশে ব্যাংক ঋণ পাবে।

(জ) **গরিব মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান :** 'আনন্দধারা' প্রকল্পের লক্ষ্যই হল গরিব মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান তৈরি এবং তার স্বশক্তিকরণ। এই প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন স্তরে তৈরি করা হবে। একদম তৃণমূলস্তরে, অর্থাৎ পাড়ায় স্বনির্ভরগোষ্ঠী, গ্রাম সংসদে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর উপসংঘ, গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে সংঘ এবং পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে তৈরি হবে মহাসংঘ। এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পূর্ণভাবে মহিলা পরিচালিত ও মহিলা নিয়ন্ত্রিত।

রেখাচিত্র-১
গরিব মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান

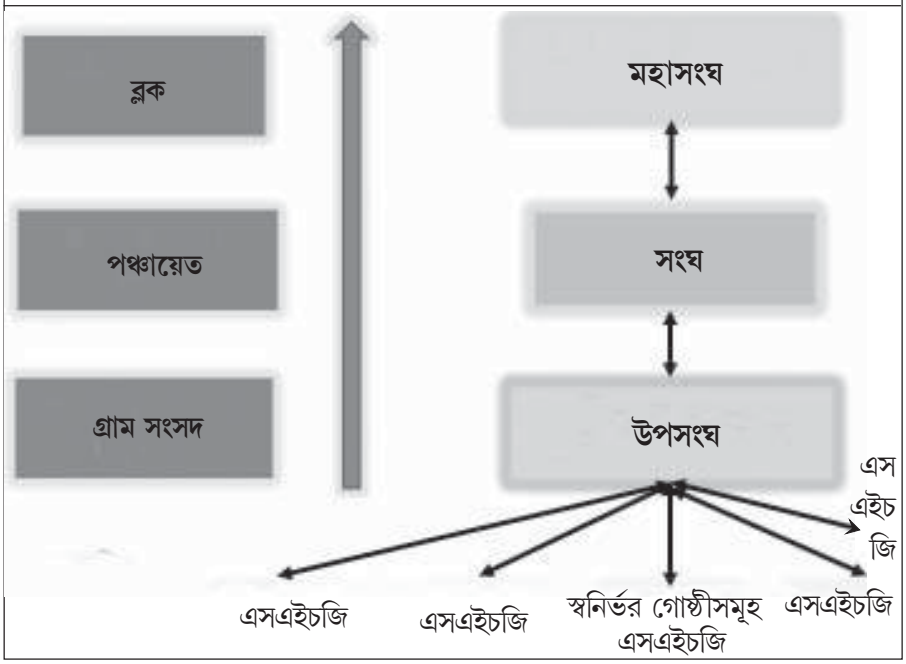

সারণি-২
পশ্চিমবঙ্গে ইনটেনসিভ ব্লক

জেলা	ব্লক
পুরুলিয়া	পারা, বাঘমুণ্ডি, জয়পুর, মানবাজার-২
বাঁকুড়া	সিমলাপাল, পাত্রসায়র, রানিবাঁধ, সালতোড়া
পূর্ব মেদিনীপুর	নন্দীগ্রাম-১, রামনগর-১, তমলুক, খেজুরি-২
কোচবিহার	সিতাই, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ি, দিনহাটা-১
জলপাইগুড়ি	কালচিনি, মাটিয়ালি, ধুপগুড়ি, আলিপুরদুয়ার-১
মালদা	হবিবপুর, মানিকচক, কালিয়াচক-১, হরিশ্চন্দ্রপুর-২
বীরভূম	দুবরাজপুর, রামপুরহাট-১, মহম্মদবাজার, বোলপুর-শান্তিনিকেতন
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	পাথরপ্রতিমা, জয়নগর-২, বিষ্ণুপুর-২, বাসন্তী

সারণি-৩
পশ্চিমবঙ্গে পার্টনারশিপ মডেল ব্লক

জেলা	ব্লক	চিহ্নিত অ-সরকারি সংস্থা
নদীয়া	রানাঘাট-১	SPADE
মুর্শিদাবাদ	নবগ্রাম	SPADE
উত্তর দিনাজপুর	হেমতাবাদ	লোক কল্যাণ পরিষদ
দক্ষিণ দিনাজপুর	হরিরামপুর	লোক কল্যাণ পরিষদ
পশ্চিম মেদিনীপুর	বিনপুর	PRADAN
পুরুলিয়া	বাঘমুণ্ডি	PRADAN

(ঝ) **প্রশিক্ষণ :** দক্ষ সম্পদকর্মী ও জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বশক্তি-করণের লক্ষ্যে 'আনন্দধারা'-য় ধারাবাহিক এবং প্রয়োজনভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ বহুমুখী। একদিকে

সম্পাদকর্মীদের দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি, সংঘগুলিকে সমবায় হিসেবে কার্যকরী করে তোলা এবং অংশগ্রহণকারীদের জীবিকা বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন আয় রোজগারি কাজের উপর হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এছাড়া প্রতিটি জেলায় একটি নির্দিষ্ট ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে রুরাল সেল্‌ফ এমপ্লয়মেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RSETI) প্রতিষ্ঠা করা হবে। ইতিমধ্যেই অনেক জেলাতেই RSETI কাজ শুরু করে দিয়েছে।

(ঞ) **সমন্বয়সাধন :** 'আনন্দধারা'-র সাফল্য বহুলাংশেই নির্ভর করছে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সঙ্গে জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমন্বয়সাধন এবং দারিদ্রের বিভিন্ন কারণগুলি সমাধান করা। এর জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে, সেগুলি হল :

- **স্বত্বাধিকার :** গণবণ্টন ব্যবস্থা, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন, শিক্ষার অধিকার, রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা, আম আদমি বিমা যোজনা ইত্যাদি।
- **জীবনযাত্রার গুণগত মান বৃদ্ধি :** স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, পানীয় জল, স্বাস্থ্যবিধান, আবাসন, বিদ্যুৎ ইত্যাদি।
- **দক্ষতা বৃদ্ধি :** বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।
- **জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি :** প্রাতিষ্ঠানিক ও বিধিবদ্ধ ঋণের সুবিধা, কৃষি-প্রাণীসম্পদ, ক্ষুদ্রশিল্প/উদ্যোগ ইত্যাদি।

আমরা আগেই আলোচনা করেছি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে জীবিকা বিকাশ এই প্রকল্পের লক্ষ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জীবিকা বা লাইভলিহুড বলতে এখানে ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য যেমন, ঋণ ও অন্যান্য পরিষেবার উপর জোর দেওয়া হবে (সার্ভিস ডেলিভারি অ্যাপ্রোচ), তেমনি পাশাপাশি গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য যে সকল সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলি আছে, তা যাতে তাঁরা করায়ত্ত করতে পারে, সেদিকেও সমান আলোকপাত করতে হবে (রাইট বেস্‌ড অ্যাপ্রোচ)। আর এই কারণেই বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী বিভাগীয় দপ্তরগুলির সঙ্গে জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলির সমন্বয়সাধন (কনভার্জেন্স) একান্ত জরুরি।

সারণি-৪
পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভরগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান গঠনের অগ্রগতি

স্তর	প্রতিষ্ঠান	সংখ্যা	
		লক্ষ্যমাত্রা	সম্পন্ন
গ্রাম সংসদ	উপসংঘ	৩৭৪২৬	২৬৬৬৩
গ্রাম পঞ্চায়েত	সংঘ	৩৩৪৯	২৭০০
পঞ্চায়েত সমিতি	মহাসংঘ	৩৪১	২৩

সারণি-৫
ভারতবর্ষে স্বনির্ভরগোষ্ঠী ব্যাংক সংযোগের অগ্রগতি (২০১২-২০১৩)

ক্রমিক	বিবরণ	সাফল্য	
		সংখ্যা (লক্ষ)	আর্থিক (কোটি টাকায়)
১(ক)	মোট স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা	৭৩.১৮	৮২১৭.২৫
১(খ)	এর মধ্যে শুধুমাত্র মহিলাগোষ্ঠী	৫৯.৩৮	৬৫১৪.৮৭
২(ক)	ব্যাংক ঋণপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর সংখ্যা (২০১২-'১৩)	১২.২০	২০৫৮৫.৩৬
২(খ)	ব্যাংক ঋণপ্রাপ্ত শুধুমাত্র মহিলাগোষ্ঠী	১০.৩৭	১৭৮৫৪.৩১
৩(ক)	ব্যাংক ঋণ বাকি এমন গোষ্ঠী (৩১ মার্চ, ২০১৩)	৪৪.৫১	৩৯৩৭৫.৩০
৩(খ)	ব্যাংক ঋণপ্রাপ্ত শুধুমাত্র মহিলাগোষ্ঠী (৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত)	৩৭.৫৭	৩২৮৪০.০৪
৪	গোষ্ঠী প্রতি গড় ঋণের পরিমাণ	—	১৬৮৭৫৭.২৬
৫	স্বনির্ভরগোষ্ঠীভুক্ত পরিবার (১১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত)	৯৫ মিলিয়ন	—

দক্ষতা বিকাশ উদ্যোগ

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে 'দীনদয়াল উপাধ্যায় গ্রামীণ কৌশল্যা যোজনা' (DDU-GKY) চালু হয়েছে এবং NRLM-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ২০২২ সালের মধ্যে দেশে ৫০০ মিলিয়ন যুবক/যুবতীকে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের আওতায় আনার পরিকল্পনা নিয়েছে। ২০১১-র আদমশুমারি অনুসারে দেখা গেছে দেশে শুধুমাত্র গ্রামীণ এলাকায় ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে প্রায় ৫৫ মিলিয়ন সম্ভাবনাপূর্ণ মানব সম্পদ রয়েছে, পাশাপাশি বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশে আগামী ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় ৬০ মিলিয়ন দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা তৈরি হবে। স্বাভাবিকভাবেই, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যদি দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি করা যায়, তবে দেশের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে দক্ষ মানব মূলধনে (স্কিল ক্যাপিটেল) পরিণত করা সম্ভব হবে।

DDU-GKY প্রকল্পের মূল বৈশিষ্ট্য এখানে শুধুমাত্র গ্রামীণ যুবশক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া নয়; বরং বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তাদের কাজের বাজারের চাহিদার সঙ্গে উপযুক্ত করে তোলা এবং উৎসাহভাতা প্রদান সহ বিভিন্ন পরিষেবা দিয়ে স্থায়ী কর্মসংস্থানে যুক্ত করা। এককথায়, DDU-GKY-র লক্ষ্যই হল প্রশিক্ষণ প্রদান থেকে কর্মজীবনের উত্থান (কেরিয়ার প্রোগ্রেশান)। প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের বয়সসীমা সাধারণত ১৫-৩৫, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন, মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যা, অতি দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, এইচ.আই.ভি. আক্রান্ত ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বসীমা ৪৫ বছর।

মূলত প্রকল্পটি ২টি স্তরে রূপায়িত হবে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে DDU-GKY জাতীয় ইউনিট প্রকল্পের নীতি প্রণয়ন, আর্থিক ও প্রযুক্তি সহায়তা দেবে, রাজ্য

স্তরে রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশন (পশ্চিমবঙ্গে আনন্দধারা) প্রকল্পটি রূপায়ণ করবে বিভিন্ন পেশাদারি সংস্থার মাধ্যমে।

দক্ষতাবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি মূলত ৭টি ধাপে রূপায়িত হবে। প্রথম, জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, গরিব পরিবার থেকে যুবক/যুবতী চিহ্নিত করা। তৃতীয়, আগ্রহীদের সমবেতকরণ। চতুর্থ, পরামর্শ দান, পঞ্চম, চিহ্নিত যুবক/যুবতীদের স্বাভাবিক কর্মপ্রবণতা দেখে নির্বাচন। ষষ্ঠ, শিল্প ও কাজের বাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং সপ্তম, কাজের সঙ্গে যুক্ত করা এবং ন্যূনতম মজুরি সুনিশ্চিত করা। এখানে মূল আলোকপাত করা হবে কর্মসংস্থানের পর তা স্থায়ী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন দপ্তরের/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন।

রেখাচিত্র-২
এন.আর.এল.এম.-'আনন্দধারা' মডেল

প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

আমাদের রাজ্যে NRLM যে, ২০১২ সালে 'আনন্দধারা' নামে উদ্বোধন হলেও বর্তমান বছরের শুরু থেকেই দ্রুতগতিতে কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ৮টি জেলার ৩২টি ব্লকে নিবিড়ভাবে কাজ শুরু হয়েছে। এই ব্লকগুলি 'ইনটেনসিভ ব্লকস্' নামে পরিচিত। অন্যদিকে ৫টি ব্লকে চিহ্নিত অ-সরকারি সংস্থার সঙ্গেও নিবিড়ভাবে কাজ চলছে। এই ৫টি ব্লক পার্টনারশিপ মডেল ব্লকস্-এর অন্তর্গত। (সারণি-২ ও ৩-এ ইনটেনসিভ ও পার্টনারশিপ ব্লক-এর তালিকা তুলে ধরা হল।)

পশ্চিমবঙ্গে স্বনির্ভরগোষ্ঠী—ব্যাংক সংযোগ কর্মসূচির দিকে যদি আমরা আলোকপাত করি তবে দেখা যাবে গোষ্ঠী গঠন এবং গোষ্ঠীভিত্তিক সংঘ গঠনে সংখ্যার দিক থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকলেও গুণগতমান এবং আয়-রোজগারি কাজ বা জীবিকার লক্ষ্যে এখনও আমরা বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছি। একথা অনস্বীকার্য, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে অনেকটাই স্বনির্ভর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা গেছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে আমাদের দলগুলির অগ্রাধিকার সঞ্চয় বাড়ানোর দিকে। কিন্তু ব্যাংক ঋণের সাহায্যে জীবিকার উদ্যোগ গ্রহণে বিশেষ সাফল্য পাওয়া যায়নি। আমাদের রাজ্যে স্বনির্ভর দলগুলির গড় ঋণের পরিমাণ মাত্র ৫৩,৯৬০ টাকা, যেখানে জাতীয় গড় ১,৬৮,৭৫৭ টাকা। গোষ্ঠীগত উদ্যোগে জীবিকা বিকাশে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য না পাওয়ার কারণ, শুধু ঋণের জোগান হলেই উদ্যোগ গঠন হয় না। পাশাপাশি প্রয়োজন পরিকাঠামো, বাজারভিত্তিক দক্ষতা বিকাশ প্রশিক্ষণ, বিমা-সহ বিপণন সুবিধা। আর এই কাজ তখনই ফলপ্রসূ হবে যদি গোষ্ঠীভিত্তিক সংঘ ও মহাসংঘগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হয় এবং সমন্বয়সাধনে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। সুতরাং, 'আনন্দধারা'-র সাফল্য পেতে গেলে আগে স্বনির্ভরগোষ্ঠী ও সংঘগুলিকে ধারাবাহিকভাবে পেশাদারি সহায়তা দিয়ে সক্রিয় করে তুলতে হবে, শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নভাবে কিছু জীবিকার উদ্যোগ নিলে সাফল্য পাওয়া কঠিন। এর পাশাপাশি ব্যাংকগুলিকেও গোষ্ঠীবান্ধব (SHG ফ্রেন্ডলি) হতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, স্বনির্ভর-গোষ্ঠীকে ঋণ দানে অনেকক্ষেত্রেই ব্যাংকের অনীহা থাকে। রাজ্যস্তরের ব্যাংকার্স কমিটি স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে শুরুতেই ১ লক্ষ টাকা ঋণদানের সিদ্ধান্ত নিলেও বাস্তবে তা খুব কমই কার্যকরী হয়। ফলে ব্যবসার জন্য পুঁজির অপ্রতুলতা খুবই স্বাভাবিক, যা আদতে জীবিকা বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি অনেক স্বনির্ভর-গোষ্ঠীই ব্যাংক ঋণ না পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। এছাড়া আরও একটি সমস্যা রয়েছে আমাদের রাজ্যে। তা হল সঠিক স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা নিয়ে। যদিও রাজ্যস্তরে সমস্ত ধরনের স্বনির্ভরগোষ্ঠী নিয়ে একটি তথ্যভাণ্ডার তৈরির কাজ চলছে। এটি সম্পূর্ণ হলে সঠিক সংখ্যা এবং বাস্তবে স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলির সঠিক অবস্থা অনেকটাই অনুধাবন করা যাবে। এর পাশাপাশি স্বনির্ভরগোষ্ঠীগুলিকে শক্তিশালী করতে গেলে বিশেষভাবে জোর দিতে হবে আর্থিক সাক্ষরতার (ফাইন্যানশিয়াল লিটারেসি) উপর। কারণ রাজ্যে সাম্প্রতিককালে অনেক স্বনির্ভরগোষ্ঠীই তাদের কষ্টার্জিত টাকা চিট ফান্ডে রেখে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে।

পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

এন.আর.এল.এম.—'আনন্দধারা' রূপায়ণে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ও কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। বাস্তবিক, পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠানের সক্রিয়

সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ ছাড়া এই মিশন সফল করা কঠিন। মূলত যে দিকগুলিতে পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান; বিশেষ করে গ্রাম পঞ্চায়েত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তা হল :

● এলাকায় গরিব মানুষ, বিশেষ করে, তফশিলি জাতি ও উপজাতি, মহিলাপ্রধান পরিবারগুলি চিহ্নিত করে স্বনির্ভরগোষ্ঠীভুক্ত করা

● স্বনির্ভর দলের উচ্চতর সংঘ; বিশেষ করে উপসংঘ ও সংঘ গঠনে সহায়তা করা

● সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সঙ্গে স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সদস্যাদের পরিবারের সমন্বয়সাধন; বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য বিমা যোজনা, আম আদমি বিমা যোজনার মতো জীবনের নিরাপত্তামূলক প্রকল্পগুলির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ

● স্বনির্ভরগোষ্ঠীর চাহিদাগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের বার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা ও বাজেট বরাদ্দ করা

● মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইনে আরও বেশি মহিলাকে কাজে যুক্ত করা

● গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরের সম্পদ ও সম্পদকর্মীদের (প্রাণীবন্ধু, কে.পি.এস.) স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের উন্নয়নের কাজে লাগানোর সুযোগ করে দেওয়া।

সামাজিক সমবেতকরণের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি NRLM আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ (ফাইন্যানশিয়াল ইনক্লুশান) কর্মসূচিটিও রূপায়ণে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতবর্ষে মোটামুটি ৬০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে। এন.আর.এল.এম.-এর ফলে প্রাতিষ্ঠানিক পরিষেবা প্রদান ও দক্ষতা বিকাশ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের মধ্যে অর্থকরী কাজে ঋণ নেওয়ার ক্ষমতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। তবে বিষয়টি নির্ভর করছে ব্যাংক ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ও মানসিকতার উপর।

স্বনির্ভরগোষ্ঠীর মতো জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে দেখতে হবে।

সুতরাং, একদিকে স্বনিযুক্তি প্রকল্প, গরিব মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন এবং অন্যদিকে মহাত্মা গান্ধী জাতীয় কর্মনিশ্চয়তার মতো মজুরিভিত্তিক কর্মসূচি এবং বয়স্ক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প রূপায়ণের মাধ্যমে আশা করা যায় দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকাংশেই উন্নত করা সম্ভব হবে।❑

[লেখক দীর্ঘ ১৪ বছর গ্রামোন্নয়ন ও গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে SPADE (কলকাতা)-র Manager (Operations) পদে কর্মরত এবং 'আনন্দধারা' প্রকল্পের সঙ্গে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদে যুক্ত।
Email : raj.csr.cesc@gmail.com
rajkumarlaskar@gmail.com]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

দক্ষতা উন্নয়নের চালচিত্রে ত্রিপুরা

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এই রাজ্যের আর্থিক বিকাশ ও উন্নয়নের দক্ষতা বৃদ্ধির ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করছেন **স্তবক রায়**। *দক্ষতা উন্নয়নের পথে আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলো কীভাবে বাধা সৃষ্টি করে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে এই নিবন্ধে।*

সার্বিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের উৎপাদনের গুণগত মান ও সামাজিক উৎকর্ষতার উন্নতি ঘটে। ভারতে দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক চিন্তাভাবনা শুরু হয় বিশ্ব অর্থনীতির এমন এক তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্তে যখন সমসাময়িক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে চীন, পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা দক্ষতা উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। জনসংখ্যা তাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, ভারতের সামনে বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করার এক অনন্য সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। এই উন্নতির কারণ মূলত নিম্নগামী জন্মহার, নির্ভরশীল জনসংখ্যার আপেক্ষিক পরিবর্তন এবং ২০-২৫ বছর বয়সি কর্মক্ষম ও উৎপাদনশীল যুব সমাজের উত্থান। এই উদ্দেশ্যে ২০১৪ সালে স্বাধীন ক্ষমতা সম্পন্ন দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রক গড়ে তোলে ভারত সরকার।

জ্ঞান ও দক্ষতা যে কোনও অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার। ইংল্যান্ড, জার্মানি, আমেরিকা, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াতে যথাক্রমে ৭১, ৬৮, ৭৫, ৫২ ও ৮০ শতাংশ শ্রমিককেই দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। অন্যদিকে ভারতে এই হার মাত্র ২.৩ শতাংশ।

দক্ষতা বৃদ্ধির হার ভারতবর্ষের সর্বত্র সমান নয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল দেশের সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চল। মূলত ভূ-প্রাকৃতিক বিভিন্নতার কারণে অঞ্চলটি শিল্পায়ন ও দক্ষতা উন্নয়নে দেশের পিছনের সারিতে অবস্থান করে। দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধির কারণে অঞ্চলটির আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে সার্বিক চাহিদার হার। এর ফলে উৎপাদন একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। যথেষ্ট পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা না থাকার কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি উৎপাদন স্বাবলম্বী ও দক্ষতার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পারছে না। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্যগুলিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দক্ষতা উন্নয়নের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ত্রিপুরা উত্তর-পূর্ব ভারতের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য যার ভৌগোলিক আয়তন ১০,৪৯১ বর্গ কিলোমিটার। এই রাজ্যটির তিন দিক (উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম) বাংলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব দিকে যথাক্রমে আসাম ও মিজোরাম অবস্থিত। ত্রিপুরা রাজ্যের মোট সীমান্তের ৮৪ শতাংশই আন্তর্জাতিক সীমান্ত যা বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত।

১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা ভারতীয় অঙ্গরাজ্য হিসাবে যুক্ত হয়। দীর্ঘ ২৩ বছরের প্রতীক্ষার পর ১৯৭২ সালে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পায়। পরবর্তী সময়ে, নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আঙ্গিকে আত্মপ্রকাশ করে রাজ্যটি। সাধারণভাবে ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া রাজ্য হিসাবে পরিচিত ত্রিপুরা শেষ এক দশকে প্রভূত উন্নতি করে যার প্রমাণ পাওয়া যায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সূচকগুলি থেকে যেমন, অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক, মাথা পিছু আয়, শিল্পায়ন ও শিল্পায়নের পরিকাঠামো ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হল অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক যা রাজ্য বা দেশের মোট উৎপাদিত পণ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়। নিম্নে ভারতবর্ষের সাপেক্ষে ত্রিপুরার পরিসংখ্যান আলোচিত হল।

জাতীয় পণ্য সূচকের তুলনায় ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। ২০০৪-১০ সালে ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক বৃদ্ধির হার ছিল ৯.০ শতাংশ। অন্যদিকে প্রতিবেশী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির গড় অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক ৬.৩ শতাংশ এবং সমগ্র ভারতের ৮.৬ শতাংশ। (সারণী-১)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মাপকাঠি হল বার্ষিক মাথাপিছু আয়। মাথাপিছু আয়ের প্রেক্ষিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি তুলনায় পশ্চাদ্‌বর্তী। ত্রিপুরার গড় মাথাপিছু আয় ৪৫,৩৬৮ টাকা, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির গড় মাথাপিছু আয় ৪৮,৩১৭ টাকা। সেখানে ভারতের জাতীয় গড় মাথাপিছু আয় ৬১,৯৯৮ টাকা। শিল্প উন্নয়নের জন্য পরিবেশ ও পরিকাঠামোর অভাব উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির অন্যতম দুর্বলতা। ত্রিপুরাও সেই তালিকার অন্তর্গত। ২০১০ সালের পরিসংখ্যান অনুসারে ত্রিপুরাতে বর্তমান শিল্পের সংখ্যা ২৪২টি যার মধ্যে সর্বাধিক পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১২৫টি, উত্তর-দক্ষিণ ও ধলাই জেলায় এই

২০১২ সালে ত্রিপুরা রাজ্য চারটি থেকে আটটি জেলায় পুনর্বিন্যস্ত হলেও তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে পূর্ববর্তী চারটি জেলা নিয়েই আলোচনা করা হল।

সংখ্যা যথাক্রমে ৬১, ৩৩ ও ২৩। এই শিল্পগুলিতে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৫৭,৮৭৩ জন। বার্ষিক শ্রমিক বৃদ্ধির হার মাত্র ৭.৮ শতাংশ। (সারণী-২)

বড় ধরনের শিল্প এই রাজ্যে অনুপস্থিত বলা চলে। পাট শিল্পই একমাত্র মাঝারি মাপের শিল্প। রাজ্যের একমাত্র পাটকলটি আজ কাঁচামাল, মজুরি, মূলধনের পাশাপাশি রাজনৈতিক কারণে সমস্যার সম্মুখীন। শিল্পের সঙ্গে জড়িত প্রায় ১২০০ শ্রমিকের জীবন জীবিকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দিতে পারেনি রাজ্য সরকারের শিল্পনীতি। ২০০৯ সালে রাজ্য সরকার নয়টি শিল্প ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করে। যথা, বাঁশ, চা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, পর্যটন, তথ্য-প্রযুক্তি ও ঔষধি বৃক্ষ। এই শিল্পসমূহের উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের শিল্প মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শিল্পায়নের পথে বারবার বাধার সৃষ্টি করেছে। মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের বাজারে শিল্প ও শিল্পের জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে রাজ্য। শিল্প ও শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নের যে পরিকাঠামো বর্তমান ত্রিপুরায় আছে তা নিম্নে আলোচিত হল।

সারণি-১
মোট অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক

দেশ/অঞ্চল/রাজ্য	রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক বৃদ্ধির হার (২০০৪-১০)	রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ পণ্য সূচক
ভারত	৮.৬	৪২,৯১,৩৯,৩৫৯
উত্তর-পূর্বাঞ্চল	৬.৩	১,১৯,২৩,৯৬৯
ত্রিপুরা	৯.০	১৪,৬০,৪২৮

সারণি-২
মাথাপিছু আয়

দেশ/অঞ্চল/রাজ্য	মাথাপিছু আয় (২০১০-১১) (টাকার অঙ্কে)
ভারত	৬১,৯৯৮
উত্তর-পূর্বাঞ্চল	৪৮,৩১৭
ত্রিপুরা	৪৫,৩৬৮

সড়ক পথ

ত্রিপুরার মোট সড়ক পথের দৈর্ঘ্য ১৬,৯৩১ কিলোমিটার। জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক ছাড়াও গ্রামীণ রাস্তাগুলির অবস্থা যথেষ্ট ভালো। বেশিরভাগ রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছে সীমান্ত রাস্তা সংস্থা এবং PWD। জাতীয় নিরাপত্তার কারণে সীমান্ত রাস্তা সংস্থা রাস্তাগুলি নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করলেও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হয় এই সড়ক পথগুলির মধ্য দিয়ে। ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরে চুড়াইবাড়ি থেকে দক্ষিণে সাব্রুম পর্যন্ত ১৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ ৪৪নং জাতীয় সড়কই হল ত্রিপুরার অর্থনীতির জীবনরেখা। এই জাতীয় সড়কের প্রায় সমান্তরালে স্থিত ১৫১.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ যা উত্তরে চুড়াইবাড়ি থেকে পশ্চিমে আগরতলা পর্যন্ত বিস্তৃত। দুটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন ও দুটি এক্সপ্রেস ট্রেন যথাক্রমে আগরতলা-ধর্মনগর রুটে এবং এক্সপ্রেস ট্রেন দুটি আগরতলা থেকে আসামের লামডিং ও আগরতলা থেকে আসামের শিলচরের মধ্যে চলাচল করত। তবে সমস্যার সূত্রপাত ২০১৪ সালের অক্টোবর মাস থেকে যখন রেলমন্ত্রক উন্নততর পরিষেবা প্রদান করার জন্য মিটার গেজ লাইন পরিবর্তন, আগরতলা থেকে দক্ষিণে সাব্রুম পর্যন্ত লাইন সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রেল পরিষেবা সাময়িক বন্ধ রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তথ্যানুসারে ২০১৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে গেজ পরিবর্তন কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হবে। রেলপথের মাধ্যমে মানুষ-পণ্য থেকে তথ্য-প্রযুক্তি আদান-প্রদান সম্ভব হবে যা দক্ষতা উন্নয়ন ও সংস্কৃতির উন্নয়নে সদর্থক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হয়।

আকাশ পথে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা সরাসরি যুক্ত কলকাতা, দিল্লি ও গুয়াহাটির মতো বৃহৎ শহরের সঙ্গে। দ্রুত যাত্রী পরিবহণে আকাশ পথের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হলেও পণ্য পরিবহণের জন্য যথোপযুক্ত নয়।

শিক্ষা পরিকাঠামো

দক্ষতা উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধির পীঠস্থান। ২০০৯-১০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩৫৬টি যার মধ্যে সর্বাধিক ৩৭ শতাংশ বিদ্যালয়ই পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থিত। ৪৩৫৬টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২২৮০টি বিদ্যালয় প্রাথমিক, ১২৫০টি উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫০৯টি মাধ্যমিক ও ৩১৭টি উচ্চ-মাধ্যমিক, উক্ত বছরের তথ্যানুসারে ২০১০ সালে ত্রিপুরায় শিক্ষকের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৫,৯৫৬ এবং ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮,১১,৩৫৯ অর্থাৎ শিক্ষক ছাত্র অনুপাত হল ১ : ২৩। রাজ্যে মাত্র ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ আছে। মাত্র দুটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ একটি জাতীয় স্তরের প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যা দক্ষ প্রকৌশলিক গঠনের কাজ করে চলেছে। একটি করে আইন, সংগীত ও কলা মহাবিদ্যালয় রাজ্যে অবস্থিত। দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কেন্দ্রীয় ও অপরটি বেসরকারি অধীনে রাজ্যের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাস্থ্য মানচিত্রে ৬টি হাসপাতাল, ৩টি জেলা হাসপাতাল, ১৩টি মহকুমা হাসপাতাল, ১৮টি গ্রামীণ হাসপাতাল,

৮৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ৮২৮টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৮টি রক্ত ভাণ্ডার ও সঞ্চয়াগার অবস্থিত। হাসপাতালগুলির সম্মিলিত শয্যা সংখ্যা মাত্র ৩,৩২১টি, এর মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আছে ৫৮৪টি। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্যানুসারে বর্তমানে ৮৪০ জন ডাক্তার ও ১৩৯৮ জন নার্স স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করে।

জন্মহার ও মৃত্যুহার চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিসংখ্যানের মাপকাঠি। ত্রিপুরার জন্মহার (প্রতি হাজার জনে) মাত্র ১৪.৮ যেখানে ভারতের গড় স্থূল জন্মহার ২২.৫ জন। মৃত্যুহার তুলনামূলকভাবে ভারতীয় হারের তুলনায় অনেকটাই কম যা চিকিৎসা ব্যবস্থা ও উন্নততর জীবনযাত্রাকে নির্দেশ করে, দেশে যখন প্রতি হাজার জনপিছু শিশু মৃত্যুর হার ৬০ তখন উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির অন্যতম ত্রিপুরা রাজ্যে শিশু মৃত্যুর হার মাত্র ৩০। যদিও রাজ্যের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূত উন্নতি দরকার।

ব্যাংক পরিষেবা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম রূপ হল ব্যাংক পরিষেবা। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে ত্রিপুরার মাত্র ২৬.৫ শতাংশ পরিবার ব্যাংকিং পরিষেবা গ্রহণ করে অন্যদিকে সর্বভারতীয় স্তরে এই পরিষেবার হার ৩৫.৫ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্য অনুসারে ১৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও ৩টি আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাংক ত্রিপুরায় পরিষেবা প্রদান করে। রাজ্যে এই ব্যাংকগুলির সংবলিত শাখার সংখ্যা ৪৯৬। ২০১৩ সালে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ঋণ গ্রহণের হার ৪২.০৯ শতাংশ। দক্ষতা বৃদ্ধি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের সঙ্গে ব্যাংকগুলি কৃষি ঋণ ও স্বনির্ভর-গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন ঋণ দান করে। ২০১৩-১৪ সালের তথ্য অনুসারে ৩৪,০৮৯ জন কৃষক কৃষিঋণ গ্রহণ করেছে এবং ৩৪৭টি স্বনির্ভরগোষ্ঠী বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রায় ১১১.২৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে।

সারণি-৩
জাতীয় পরিসংখ্যানের সঙ্গে ত্রিপুরার তুলনা

সূচক	ভারতবর্ষ	ত্রিপুরা
স্থূল জন্মহার (প্রতি ১০০০ জনে)	২২.৫	১৪.৮
স্থূল মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জনে)	৭.৩	৫.৩
শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জনে)	৫০.৫	৩০.০

বিদ্যুৎ পরিষেবা

২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ত্রিপুরার ৯৫ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবহারের ৬৪ শতাংশ বিদ্যুৎ রাজ্য উৎপাদন করতে সক্ষম। রাজ্যে একটি জলবিদ্যুৎ ও তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। ১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গোমতী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ১৯৭৬ সালে গড়ে তোলা হয়। বর্তমানে জলের অভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। অপরদিকে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পরিচালিত। ত্রিপুরা রাজ্যের তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হল বরমুড়া, রখিয়া ও পালাটান এই তিন বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্মিলিতভাবে ১৩৭ মেগাওয়াট উৎপাদন করে। বৃহৎ শিল্প রাজ্যে না থাকার কারণে বেশিরভাগ বিদ্যুৎ গার্হস্থ্য ও ছোট শিল্পে ব্যবহৃত হয়। তথাপি উৎপাদিত বিদ্যুৎ শিল্পের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র ও দক্ষতা

জীবনধারা নির্ণয় এবং মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্মসৃজন ও দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আগামী দশকগুলিতে অর্থনৈতিক, উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে দক্ষতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিল্পে বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও পরিকাঠামোজাত উন্নয়নকে তাৎপর্যপূর্ণ স্তরে প্রতিস্থাপিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও বিপণন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

ত্রিপুরার প্রেক্ষাপটে কয়েকটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, হস্ত ও তাঁত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, হোটেল ও পর্যটন শিল্প, তথ্য-প্রযুক্তি উদ্যান পালন, রবার, বর্ডার ট্রেড, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। এই সকল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির যেমন কিছু আঞ্চলিক সুবিধা আছে তেমন কিছু দুর্বলতাও আছে। দুর্বলতা দূরীকরণ ও দক্ষতা উন্নয়নের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা সম্ভব।

হস্ত ও তাঁর শিল্প

প্রথাগত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হিসাবে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল হস্ত ও তাঁত শিল্প। ত্রিপুরার ৯০ শতাংশ হস্ত ও তাঁত শিল্প গড়ে উঠেছে তপশিলি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। বর্তমানে কাঁচামালের অভাব, পুরানো যন্ত্রপাতি, নিম্নমুখী চাহিদা, বিশ্বায়নের প্রভাবে এই শিল্প রুগ্‌ণ প্রায় চেহারা ধারণ করেছে। ত্রিপুরা হস্ত ও তাঁত উন্নয়ন নিগমের তথ্যানুসারে বর্তমান ৬১৫০ জন এই শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। আম্বেদকার হস্ত শিল্প যোজনায় ২০১১-১২ অর্থ বর্ষে ১৪২৭.৩৪ লক্ষ টাকা হস্ত ও তাঁত শিল্প উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার হস্ত ও তাঁত উন্নয়ন নিগমের মধ্যে ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার বাইরে মোট ১৬টি বিপণন কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্রমাগত প্রচেষ্টা ত্রিপুরা রাজ্যে পরিলক্ষিত হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ

ত্রিপুরার মৃত্তিকা ও জলবায়ু আনারস, কাঁঠাল ও কলা উৎপাদনের জন্য আদর্শ। উৎপাদিত ফল অতীতে সহজে বাজারজাত

করা সম্ভব হত না, ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী নষ্ট হত। এই সমস্যা থেকে রাজ্যকে উন্নীত করার জন্য ১৯৯০ সালের পর থেকে গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে ৩ একর জমির উপর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ তালুক গড়ে তোলে। যা আগরতলা শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে বড়জং নগরে অবস্থিত। অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার অপ্রতুলতা এই শিল্পের সাফল্যের অন্যতম অন্তরায়। কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক খাদ্যদ্রব্যের গুণগতমান বজায় আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমানে বড়জং নগর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ তালুকে প্রায় ৫০০ লোক কাজ করে। আশা করা যায় ২০১৭ সালে আরও ১০০০ কর্মসংস্থান হবে ত্রিপুরার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে।

পর্যটন ও হোটেল শিল্প

পর্যটন শিল্পের অনুসারী শিল্প হিসাবে গড়ে ওঠে হোটেল শিল্প। ১৯৯১ সালে ত্রিপুরা সরকার পর্যটনকে শিল্প হিসাবে তুলে ধরে পরবর্তী সময়ে গড়ে তোলা হয় ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম। ২০১৩-১৪ সালের তথ্যানুসারে বর্তমান রাজ্যে ৩৩টি দর্শনীয় স্থান আছে। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে ৬টি পর্যটন প্যাকেজের ব্যবস্থা করেছে ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম। রাজ্যে বেসরকারি হোটেল শিল্প গড়ে না ওঠায় পর্যটকদের সুবিধার্থে ১৭টি হোটেল পর্যটন দপ্তর চালায়। ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ না থাকার ফলে পর্যটকদের সর্বোচ্চ পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয় না। সুস্থিত রাজনৈতিক পরিবেশ, সুলভ পর্যটন প্যাকেজ ও অন্যান্য সুবিধার জন্য ২০০৮ সাল থেকে পর্যটন শিল্পে লেখচিত্র ঊর্ধ্বমুখী।

পরিশেষে বর্তমান ত্রিপুরার শিল্পায়ন ও শিল্প পরিকাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিটি শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজন উন্নততর প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি থেকে উৎপন্ন হবে উন্নতমানের সম্পদ। সেই সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ভবিষ্যতে রাজ্য তথা দেশের অর্থনৈতিক মানচিত্রকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে।❑

[লেখক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক।]

কর্মমুখী দক্ষতা সঞ্চারের মাধ্যমে মানব মূলধনের বিকাশ

আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কাজে নিয়োগে যোগ্যতা অর্জনের দক্ষতালাভের উপযোগী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় না। যার ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজে নিয়োগের যোগ্য বলে পরিগণিত হওয়া শিক্ষিতদের হার এ দেশে একেবারেই কম। বর্তমান নিবন্ধে এ কথা আলোচনা করে **শচীন অধিকারী** *বলতে চেয়েছেন যে, কর্মমুখী দক্ষতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চাই যেটা ছাত্রদের কাজে নিয়োগের উপযুক্ত এবং কর্মমুখীভাবে দক্ষ করে তুলবে তাদের পাশ করে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে।*

সমীক্ষায় জানা গেছে যে, ভারত হল বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি। আর এর জনসংখ্যার ৬৪ শতাংশেরও বেশি লোকের বয়স কম হওয়ায় এটি হবে কর্মযজ্ঞ জনবলের দ্বারা সমৃদ্ধ নবীনতম রাষ্ট্র। ভারতের প্রতিভাবান এবং কাজের উপযুক্ত জনবল থাকায় ২০২০-তে এ দেশের জনসংখ্যাগত কর্মনিয়োগ যোগ্যতা যেন সোনার খনি হয়ে দাঁড়াবে।

বর্তমানের উচ্চগতিসম্পন্ন বিকাশ ও এ দেশে গতিসম্পন্ন বিনিয়োগ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ কারিগরিমান ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা সম্পন্ন সম্পদের চাহিদা ক্রমশ বাড়বে। ২০১৫ অর্থাৎ চলতি বছরেই ভারত কেবল তথ্য-প্রযুক্তি দ্বারা চালিত ক্ষেত্রে অন্তত ২৩ লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন হবে বলে এক সমীক্ষায় প্রকাশ। দুর্ভাগ্যবশত গত পনেরো বছরে ভারত মাত্র ১৫ লক্ষ পেশাদার তৈরি করতে পেরেছে। এর অর্থ খুব কম সময়ের মধ্যে তাকে আরও আট লক্ষ পেশাদার তৈরির দুরূহ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মতে ভারতের মোট পেশাদারদের মাত্র ২৫ শতাংশকেই সংগঠিত ক্ষেত্রে কাজের নিয়োগের যোগ্য বলে মনে করা হয়। অসংগঠিত ক্ষেত্র কোনও কাঠামোগত কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে কর্মমুখী দক্ষতা অর্জন ও তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির প্রশ্নই ওঠে না।

ভারতে চলতি বছরে ৫০ লক্ষ স্নাতক তৈরি হবে বলে অনুমান। যার মধ্যে মাত্র ৩৪ শতাংশই হবে নিয়োগের যোগ্য। কেননা এদের অধিকাংশেরই শিল্পক্ষেত্রে কোনও ভূমিকা থাকার মতো প্রয়োজনীয় দক্ষতা নেই। নিয়োগকর্তারা এমনই প্রার্থীর খোঁজ করেন যাঁদের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের এবং তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা রয়েছে। এর অর্থ কাজে নিয়োগের যোগ্যতার সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার চাবিকাঠিটা হল কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ। কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি থাকলেই কোনও নামকরা প্রতিষ্ঠানে কাজ পাওয়ার নিশ্চয়তা তৈরি হয় না। বেশিরভাগ তরুণ প্রার্থীরই কাজের জন্য আবেদন করার সময় একই ধরনের ডিগ্রি ও দক্ষতা থাকে। কিন্তু এদের মধ্যে কয়েকজনই কেবল সুযোগ পান। যদিও কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন হওয়াটা কাউকে শিক্ষাক্ষেত্র এবং ইন্টারভিউ দুই ক্ষেত্রেই ভালো পারদর্শিতা দেখানোর ক্ষেত্রে সাহায্য করে, কিন্তু আসল হল কোনও প্রার্থীর কাজে নিয়োগের যোগ্যতা সংক্রান্ত কর্মমুখী দক্ষতা যেটা তাকে শেষপর্যন্ত কাজটা পাইয়ে দেয়, আর সেটা ধরে রাখতেও সাহায্য করে। এর কারণ আমরা এমন এক সমাজে রূপান্তরিত হচ্ছি যেখানে কারিগরি জ্ঞানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতা স্থির করে দেয় কেউ কত কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারে দলের একজন সদস্য হিসেবে এবং কর্পোরেট জগতে কাজ করার আত্মবিশ্বাস লাভ করতে পারে। যেটা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ। এইখানেই রূপান্তরধর্মী প্রশিক্ষণের দরকার। কারিগরি জ্ঞান ব্যক্তিগত ও ব্যবস্থাপনাসম্পন্ন দক্ষতার সংহতির জন্য জরুরি এবং এটাই ছাত্রদের কর্পোরেট জগতের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা করতে পারে।

ন্যাসকম (ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার কোম্পানিজ)-এর সূত্র অনুসারে প্রত্যেক বছর ভারতীয় শ্রমবলে অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ গ্র্যাজুয়েট এবং স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রী যুক্ত হচ্ছে। তবে কারিগরি শিক্ষার স্নাতকদের মাত্র ৩০ শতাংশ এবং অন্যান্য শাখার মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশই শিল্পমহল কাজে নিয়োগের যোগ্য মনে করছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু যে নবীনদের কাজে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার অভাব আছে তাই নয় (যা থেকে তাদের কাজের সুযোগের সংস্থান হতে পারে), কিন্তু সেই সঙ্গেই ভারতীয় শ্রমবলের একটা বড় অংশের অর্জিত দক্ষতা ইতিমধ্যেই কালোত্তীর্ণ মেয়াদ ফুরিয়ে ফেলেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক বিকাশের প্রত্যাশিত মানের ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জ আরও বাড়বে। কেননা নতুন কাজের সুযোগের ৭৫ শতাংশেরও বেশি-ই দক্ষতাভিত্তিক। সরকার তাই বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের কর্মমুখী দক্ষতা বাড়ানো এবং সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে।

মানবসম্পদের বিবেচনায় নানা ধরনের ও নানা পর্যায়ের নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক কাজের ক্ষেত্রে যেহেতু অনেককেই যুক্ত

হতে হয়। সে জন্যই নিয়োগকারীরা এটাও বোঝেন যে শুধুমাত্র পেশাদারি এবং কারিগরি দক্ষতাই প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারবে না। তাদের সংস্থার মধ্যেই একদিকে ক্রেতাদের সঙ্গে আর অন্যদিকে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ কার্যকরীভাবে গড়ে তুলতে হবে। তাই যে ব্যক্তির ওই ধরনের কর্মনিয়োগ যোগ্য দক্ষতা আছে, তার কাজ পাওয়ার সুযোগটাও অনেক বেশি। বাইরে থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কারও মধ্যে কাজে নিয়োগের যোগ্যতা/সফট স্কিল বা তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতার সঞ্চার ঘটানো যায় কি না, সেটা নিয়ে চিরকালীন বিতর্ক আছে। কেননা এটা ধরেই নেওয়া হয় যে কোনও মানুষ এই সব গুণাবলি সারা জীবন ধরেই লালন-পালন করে। এটাই সত্যি যে কোনও মানুষের ব্যক্তিগত মূল ধরনটা পালটানো শক্ত। কিন্তু আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে কার্যকরী শিক্ষার সুপ্ত গুণাবলিকেও জাগিয়ে তুলে জোরদার করা যেতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা/কাজে নিযুক্ত হওয়ার সামর্থ্যসূচক দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ভারতের মতো দেশে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, এ দেশে শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিত্বের বিকাশে ততদূর এগোয় না। কর্পোরেট সংস্থাগুলি খোলা মন চায় যাতে তারা নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা পরামর্শ ও সুপারিশ ইত্যাদি সেই সব নবীনদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে পারে, যারা দলের অন্যদের সঙ্গে যেমন উপাদান ভাগ করে নিতে পারে তেমনি নিজের দিক থেকেও কিছু অবদান রাখতে পারে। এর অতিরিক্ত হিসেবে আরও যেটা জরুরি সেটা হল কর্পোরেট পরিবেশের সঙ্গে ছাত্রটির মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, প্রক্রিয়াগুলি শেখা, মানুষের আচরণ সম্পর্কে উপলব্ধি করা এবং ইতিবাচক অবদান রাখা।

বিভিন্ন সংস্থা সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে যে সব প্রবণতা খুঁজে বেড়ায় তার মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক দক্ষতা যোগাযোগের দক্ষতা আর দৃষ্টিভঙ্গি প্রেরণা পাওয়া টাইম ম্যানেজমেন্ট, নেতৃত্বদানের দক্ষতা এবং স্বাভাবিক লাবণ্য। কাজে নিযুক্ত হওয়ার উপযোগী হতে ছাত্রছাত্রীদের এমন প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া উচিত, যা তাদের প্রথাগত শিক্ষার সমান্তরালভাবে কাজে নিযুক্ত হওয়ার সামর্থ্য ও দক্ষতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে। যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরোনোর পর তারা পেশাগত ভূমিকার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারে।

রূপান্তর গঠিত প্রশিক্ষণ এই ফাঁকটাকে পূরণ করতে পারে আর বিভিন্ন সংস্থাকে কর্পোরেট দুনিয়ার ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য তৈরি করে দিতে পারে। এই সব প্রশিক্ষণগুলির দৃষ্টিভঙ্গিটা থাকে ৩৬০ ডিগ্রির আর এরা শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকেই শিক্ষার উন্মেষ ঘটিয়ে তাদের কাজে নিযুক্ত হওয়ার সামর্থ্যমূলক দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

তথ্য-প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সব থেকে জরুরি বিষয়গুলির একটা হল যে ওরা যে কোনও কাউকেই ভালো মানুষ হয়ে উঠতে সাহায্য করে যেটা তার জীবনের সব দিকে তা সে পেশাগত, ব্যক্তিগত বা সমাজগত যাই হোক না কেন সব দিকেই প্রতিফলিত হয়। আর তাকে পেশার বিকাশ ও সাফল্য লাভে সক্ষম করে তোলে।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা বা যে কোনও কর্মমুখী দক্ষতার প্রয়াস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাফল্য পেতে পারে না, সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত এএসইআর প্রতিবেদনে স্পষ্ট দেখানো হয়েছে কীভাবে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রামাঞ্চলে সরকারি স্কুলে বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে অসফল হয়ে চলেছে। এই সব স্কুলের ছেলেমেয়েরাই আমাদের ভবিষ্যৎ শ্রমবল আর যদি স্কুলছুটদের সংখ্যা এত বিরাট হয় তাহলে আমরা অবশ্যই সংকটের মুখে পড়ব। আমাদের কর্মমুখী দক্ষতার সঙ্গে সম্পৃক্ত এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা চাই যেটা ছাত্রদের কাজে নিয়োগের উপযুক্ত এবং কর্মমুখীভাবে দক্ষ করে তুলবে, তারা যে সময় পাশ করে বেরোচ্ছে তারই মধ্যে। একই সঙ্গে প্রশিক্ষক/শিক্ষকদের গুণমান আর অনুপাতটা হতে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ যাতে তারা তাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ আর জ্ঞান দু'য়েরই সঞ্চার করতে পারেন।

ভারতে বিশ্বায়ন আর বাণিজ্যিক উদারীকরণ এ দেশের শ্রম বাজারে ধারাবাহিক কিছু পরিবর্তন এনেছে। এর প্রত্যক্ষ পরিণাম হল অর্থনৈতিক সংস্কার দ্বারা উৎসাহিত প্রযুক্তির আগমন আর কর্মমুখী দক্ষতাভিত্তিক শ্রমবল বিকাশের ওপর তার প্রভাব এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে একেবারে ছোট্ট সংস্থার জন্য সুযোগের একটা নতুন জানালা খুলে দেওয়া। কর্মমুখী দক্ষতা হল মানব মূলধনের উন্নতি ঘটানো একটা পদ্ধতি যেটা শ্রমিকদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে বিশেষ করে ভারতের মতো উন্নতিশীল দেশে স্বল্প শিক্ষিত শ্রমিকদের জন্য আর তাই এই বিপুল শ্রমবলকে সমৃদ্ধ করার চাবিকাঠিটা সরাসরি এবং পরোক্ষ উপায়ে দু'ভাবেই বাজারটাকে বাড়াতে সাহায্য করে।

অসংগঠিত অর্থনীতি শ্রমিকদের দ্বারা সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে বোঝায়, আর বোঝায় অর্থনৈতিক সংস্থাকে যেটা আইন বলেই হোক বা অভ্যাসে আইনগতভাবে প্রথাগত ব্যবস্থার আওতায় সুরক্ষা দেয় না বা অপর্যাপ্ত সুরক্ষা জোগায়। বিকাশশীল দেশে প্রথা বহির্ভূত শ্রম বল বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝায় স্বনিযুক্ত সেইসব লোকদের যারা বাড়িতে থেকে কাজ করে বা রাস্তায় নেমে ব্যবসা করে। ওদের অবশ্যই সরকারি বা স্থায়ী কোনও ব্যবসার জায়গা থাকে না। বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে এক মত হন যে বেশিরভাগ বিকাশশীল দেশেই অসংগঠিত অর্থনীতি হল পূর্বাভাসযোগ্য ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক শক্তি।

বর্তমান প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটেছে প্রযুক্তির যুগে আর যদি ইন্টারনেট এবং মোবাইল মাধ্যমে শিক্ষাকে জ্ঞানলাভের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এদের প্রতিক্রিয়াটা হবে অনেক ভালো। এই সব প্রযুক্তিগুলির উচ্চবহনযোগ্যতা, ক্ষুদ্র আকার এবং কম দাম হয়ে থাকে আর এরা এক সঙ্গে বহু সংখ্যক মানুষের কাছে অবিলম্বে পৌঁছতে পারে যদি মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনকে

ব্যক্তিগত ফোনের সাহায্যে শিক্ষালাভের উপযোগী করে তোলা যায়, তাহলে বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ যুবককে শিক্ষিত করে তোলার সেটাই হবে সবথেকে সহজ আর সবথেকে সুলভ উপায়।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলির জাতীয় কমিশন (এনসিইইউএস) হল সরকারের এক উপদেষ্টা সংস্থা যা ২০০৪ সালে গড়ে তোলা হয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতার বিকাশের জন্য ধারাবাহিকভাবে বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়তে। ভারতে বর্তমানে ৫ কোটি ৯০ লক্ষ সংস্থা আছে যেগুলি ১২ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষের কাজ জোগাতে পারে। আর এদের মধ্যে ২০০৫ থেকে এ পর্যন্ত ১ কোটি ৭০ লক্ষ নতুন সংস্থাও যুক্ত হয়েছে।

শ্রমবলের অসংগঠিত অংশের সংজ্ঞা দেওয়া যায় কয়েকটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা :

সীমিত পেশাদারি দক্ষতা, স্বল্প আয়, কম উৎপাদনশীলতা এবং নীচু মাত্রায় মূলধনি বিনিয়োগ। নতুন নতুন বিপণনযোগ্য কাজের দক্ষতা গড়ে তুলতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে কাজে লাগানো হলে অসংগঠিত অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কাজের সুযোগ বাড়ানোর মাধ্যমে চক্রাকার দারিদ্রকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। আর সেই সঙ্গে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত হওয়ার সামর্থ্যটাও বেড়ে যায়। এইভাবে এই গোষ্ঠীর সকলকে প্রশিক্ষণ দেওয়াটা খুব জরুরি। তাদের কাছ থেকে সেরা উৎপাদনশীলতা সুনিশ্চিত করার মাধ্যমে দেশকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য।

অসংগঠিত অর্থনীতির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজন একটা পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গি যা শ্রমিকদের শিক্ষা ও কর্মমুখী দক্ষতার মান বাড়িয়ে পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য শ্রমবল সংক্রান্ত কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করলেই কেবল উৎপাদনশীলতা বাড়বে না। এটাও নয় যে বর্তমানে জনসাধারণ কোনও রকম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কিছুই পাচ্ছে না। বরং যে ক্ষেত্রে ওরা ভুল করতে পারে সেটা হল ওরা কেবলমাত্র কারিগরি দক্ষতা গড়ে তোলার ওপরই সবথেকে বেশি নজর দেয়। বোধ-বহির্ভূত কিংবা কম্পিউটার ভিত্তিক দক্ষতার সংহতি না ঘটিয়ে সব শিল্পেই কার্যকরীভাবে যোগাযোগ বাড়ানো দক্ষ হাতে আয়োজন করা। আগে থেকে বুঝতে না পারায় সমস্যার সমাধান করাটা আসলে মুশকিল হয়ে পড়ে। নিয়োগকারীরা সম্ভাব্য কর্মীদের মধ্যে এই সব দক্ষতার অভাব লক্ষ করেন। নতুন দক্ষতাকে বিরাট সংখ্যক শ্রমবলে সঞ্চারিত করাটা উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি কীভাবে কর্মনিয়োগের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানব মূলধনের বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন উচ্চহারে কার্যকর বাজারচালিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

নিয়োগ কর্তাদের অবশ্য নিজেদের চাহিদাটা স্পষ্ট করে দিতে হবে যাতে নতুনভাবে প্রশিক্ষিত শ্রমবলের জোগানের সঙ্গে শ্রমবলের চাহিদাটা উপযুক্তভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে। পরিপূরক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচির মধ্যে স্কুলভিত্তিক শিক্ষা, কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষালাভ এবং অসরকারি ও ব্যবসায়িক বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জ্ঞানলাভকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অসংগঠিত অর্থনীতির শ্রমিকদের কর্মমুখী দক্ষতার মান বাড়ানোর ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং সম্পদ সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী হতে পারে। কিন্তু কেবল শ্রমবল ভিত্তিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে পৌঁছোয় না। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতার ওপর কর্মমুখী দক্ষতার বিকাশের প্রভাবটাকে অর্থনৈতিক পরিবেশে বিদ্যমান অন্যান্য পরিবর্তন থেকে পৃথক করা যাবে না।

জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশ সংস্থা বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকার ও শিল্পের জন্য নানা ধরনের অসংগঠিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় ঘটানোর জন্য নানা সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বে আবদ্ধ হয়ে থাকে। দক্ষতার বিকাশ এবং কর্মীনিয়োগের লক্ষ্যটাকে সার্বিকভাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষের মাত্রা অনুযায়ী স্থির করা হয় আর জাতীয় স্তরে একটা বলিষ্ঠ নজরদারি ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

স্কিল ইন্ডিয়া কর্মসূচির লক্ষ্য হল ভারতীয়দের প্রতিভার বিকাশের জন্য সুযোগ ও সম্ভাবনা দুই-ই বাড়ানো আর কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশের নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা। এটা ২০২০ সালের মধ্যে ৫০ কোটি যুবককে প্রশিক্ষণ দানের এবং কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ দানের লক্ষ্য নিয়েছে। আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিকে বিশ্বমানের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে যাতে করে আমাদের দেশের যুবশক্তি কেবলমাত্র অন্য দেশের ঘরোয়া কাজেই নিযুক্ত না হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্যদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে।

অবশ্য এমন কথা বলা হচ্ছে না যে আমাদের কোনও কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি নেই। সরকার কর্মমুখী দক্ষতা বিকাশকে সব সময়েই জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করেছে। কিন্তু আগে গুরুত্ব দেওয়া হত সনাতনি কাজের ক্ষেত্রে আর এখন স্কিল ইন্ডিয়া কিন্তু সব ধরনের কাজের ওপরই নজর দেবে। কাঠামোগতভাবে সরকার বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যেমন আগে দায়িত্বটা বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। কিন্তু এবার সেটাকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে গোটা ব্যবস্থাটা আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ হতে পারে। ❑

[লেখক গ্লোবাল সাক্সেস ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্দেশক এবং ভিস্টার ইন্টারন্যাশনাল প্রাঃ লিঃ-এর চিফ মেন্টর।
email :
mehjabeen.sajid@viztarinternational.com]

মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধি

অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি

দেশের শ্রমের বাজারে, বিশেষত উৎপাদন শিল্পে মহিলা কর্মীদের সংখ্যাটা দিন দিন কমছে। দেশে কি তাহলে দক্ষ মহিলা কর্মীর অভাব থেকে যাচ্ছে? নাকি শিল্পক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগে অনীহার নেপথ্যে রয়েছে কোনও গুরুতর কারণ? আর যদি কোনও কারণ থেকেই থাকে, তার সমাধানের পথই বা কী? বিশ্লেষণ করেছেন **দেব নাথন।**

'স্কিল ইন্ডিয়া' উদ্যোগটি নিয়ে এখন বিস্তর চর্চা হচ্ছে। বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রসঙ্গ নিয়ে চর্চার সময় সবার আগে সেই বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করতে হবে যেগুলি তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির পথে অন্তরায়। অন্যভাবে বলতে গেলে মহিলাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গড়ে তুলতে হবে এক অনুকূল পরিবেশ। এ ক্ষেত্রে শুধু বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পাঠক্রমে মহিলাদের সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না। দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখতে সুদক্ষ মহিলা কর্মীর অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সেইসঙ্গে আরও কয়েকটা বিষয় তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। যেমন, প্রথমত, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় মহিলাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এবং দ্বিতীয়ত, এই সব বাধা অতিক্রম করেও যে সমস্ত মহিলা দক্ষতা অর্জন করেন তাদের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা দেখা দেয়।

শিল্প শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (ITI) বা দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণের জন্য কমবয়সি মেয়েরা আরও বেশি করে কেন এগিয়ে আসে না সেটাও কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন। অথচ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে (IT) তাদের ভিড় কিন্তু লেগেই থাকে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের কাছে এমন কোনও চাকরি-বাকরি বা কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকা চাই যাতে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় হওয়া অর্থের একটা সদ্‌গতি হয়। সেটা যাতে একদম জলে না যায়। আর সেই সঙ্গে একজন অদক্ষ কর্মী যে পারিশ্রমিক পান, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীটি যেন তার চেয়ে বেশি বেতনের কাজ পান সেটাও দেখতে হবে। তাছাড়া কমবয়সি মেয়েটি ওই কাজটি করার উপযুক্ত কি না বা সেই কাজে নিজের দীর্ঘ 'কেরিয়ার' গড়ে তুলতে পারবে কি না সে বিষয়টিও মাথায় রাখতে হবে।

এখানে উৎপাদন ক্ষেত্র এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মরত মহিলাদের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। গর্ভধারণকালে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রায়শই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। সন্তানের পরিচর্যার বিষয়টি তার এবং তার পরিবারের কাছে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশে শিশুদের দেখাশোনার জন্য কোনও সরকারি ব্যবস্থাপনাও নেই। আর এ দেশের পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সন্তানের পরিচর্যা, শুধু মায়ের কর্তব্য বলেই ধরে নেওয়া হয়। তাই শিশুর দেখাশোনা বা লালন-পালনের সব দায়-দায়িত্ব মহিলাদেরই কাঁধে এসে পড়ে।

তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে (এছাড়া আইনি পরিষেবা বা চিকিৎসকদের পেশার ক্ষেত্রেও বটে) মহিলা পেশাদাররা যথেষ্ট আয় করেন এবং তা দিয়ে সন্তানের পরিচর্যার পুরো ব্যয়ভার বহন করতে পারেন। তাছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ মহিলা কর্মীদের ধরে রাখার অনেক তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাই কাজের সময়সীমা অনেক শিথিল করেছে। তারা যাতে বাড়িতে বসেও অফিসের কাজ করতে পারেন সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তাই এদের ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম দেওয়া বা শিশুর দেখাশোনার জন্য চাকরি ছাড়া বা পুরো 'কেরিয়ার' বিসর্জন দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়ে না।

অন্যদিকে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে সমস্ত মহিলা শ্রমিক কাজ করেন তাঁদের মজুরি এতই কম যে বাড়িতে পরিচারিকা রেখে শিশুর পরিচর্যা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়াও আমাদের দেশের খুব কম কারখানাতেই ক্রেশের সুবিধা আছে। তাই পোশাক নির্মাণ শিল্পে যে মহিলা দর্জির কাজ করেন বা যে মহিলা ইলেকট্রনিক্স শিল্পে অ্যাসেম্বলারের কাজ করেন, সবার ভাগ্যই এক সুতোয় বাঁধা।

সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে এদের অবশ্যম্ভাবীভাবে কারখানার কাজ ছাড়তে হয়। যারা পোশাক নির্মাণ শিল্পে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বাড়িতে বসে সন্তানের দেখাশোনার পাশাপাশি, খুব কম মজুরির আংশিক সময়ের কাজ খুঁজে নেন। এতে বাড়িতে থেকে কাজটাও হয়, আবার সন্তানের দেখাশোনাও হয়, যেটা কারখানায় পূর্ণ সময়ের কাজে সম্ভব নয়।

শিশুদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং কারখানাগুলির তরফে কোনও উদ্যোগের অভাব কিন্তু সরবরাহের দিক থেকে উৎপাদন ক্ষেত্রে দক্ষ মহিলা কর্মীদের আসার পথে বড় অন্তরায়। অন্যান্য ক্ষেত্রের বেশি বেতনের চাকরির বেলায় এই বিষয়টা কিন্তু তত বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। শ্রমের বাজারে মহিলাদের অংশগ্রহণ কমে যাচ্ছে এ নিয়ে আজকাল অনেক আলাপ-আলোচনা হয়। কিন্তু গৃহস্থালির কাজ বিশেষ করে সন্তান পালনের দায়-দায়িত্ব যে শ্রমের বাজারে বিশেষত উৎপাদন ক্ষেত্রে মহিলাদের আসার পথে যে একটা বিরাট বড় বাঁধা সে দিকে কেন নজর দেওয়া হয় না? কারণ উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজ করতে এলেই মহিলাদের অনেকটা সময় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়, গৃহস্থালির সব দায়-দায়িত্ব সামলে যা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

এবার আসি চাহিদার প্রসঙ্গে। দক্ষ মহিলা কর্মীর জোগান থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তারা

তাদের কেন নিয়োগ করেন না? বর্তমানে মহিলা কর্মী নিয়োগ করলে বেতনের পাশাপাশি তার মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা বা শিশু পরিচর্যার (ক্রেশ) ব্যয়ভারও বহন করতে হয় নিয়োগকর্তাকে। এই বাড়তি ব্যয়ের বোঝা নেওয়ার চেয়ে তার কাছে পুরুষকর্মী নিয়োগ অনেক সুবিধাজনক। সে ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন কোনও সুযোগ-সুবিধাও দিতে হয় না, শিশু পরিচর্যার কোনও ব্যয়ভারও বহন করতে হয় না।

এই সমস্যার সমাধানের পথ তাহলে কী? মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা বা শিশু পরিচর্যা ব্যয়ভার তো বহন করতেই হবে। কিন্তু সেটা কি এমনভাবে করা যায় না যাতে নিয়োগকর্তাদেরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে না হয়। তাহলে তারা আর দক্ষ মহিলা কর্মীদের নিয়োগে পিছিয়ে আসবেন না। নতুন কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে মহিলা কর্মী নিয়োগের এই বাড়তি ব্যয়ভার বহনে যদি সরকার এগিয়ে আসে তাহলে একটা সমাধানের পথ বেরোতে পারে। নতুন কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধা বা শিশু পরিচর্যার একটা সুরাহা হলে কোনও বিশেষ নিয়োগকর্তার ওপর এই বাড়তি ব্যয়ের বোঝা চাপবে না, বরং তা সমস্ত করদাতার মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।

এই যুক্তির বিপক্ষে অবশ্য অনেকেই বলতে পারেন যে মহিলাদের কিছু সংখ্যক নিয়োগকর্তাকে ভরতুকি দিতে মধ্যবিত্ত করদাতা-সহ দেশের সমস্ত করদাতাকে নতুন করে করভারে জর্জরিত করা হবে কেন? তাছাড়া পরোক্ষ করদাতার (পণ্য কর) হিসাবে দেশের সমস্ত মানুষকেই তো এর মাশুল দিতে হবে। এই যুক্তিও অকাট্য। তাই নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে সেস বা লেভি আদায়ের একটা বিকল্প ব্যবস্থা চালু করা যেতেই পারে। বিভিন্ন শিল্পের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে এই সেস বা লেভি বসানো হবে এবং সেই খাতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মহিলা কর্মী মাতৃত্বকালীন সুযোগ-সুবিধার খরচ বহন করা হবে। সেস বসানো হলে সামগ্রিকভাবে নিয়োগকর্তাদের মধ্যে তার ব্যয়ভার ভাগাভাগি হয়ে যাবে (বা কোনও শিল্পের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের মধ্যে); ফলে কোনও বিশেষ একজন নিয়োগকর্তার ওপর পুরো ব্যয়ের বোঝা চাপবে না। লাভের ওপর লেভি হিসাবে এই সেস আদায় করা যেতে পারে। বর্তমানে এইভাবেই আইনানুযায়ী মুনাফার ওপর ২ শতাংশ হারে সিএসআর (CSR) ব্যয় আদায় করা হয়। দক্ষ মহিলা কর্মী নিয়োগের অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য সেস বা লেভি আদায়ের এই ব্যবস্থা কার্যকর হলে নিয়োগকর্তারা মহিলাদের নিয়োগের ব্যাপারে তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

উৎপাদন শিল্পে দক্ষ মহিলা কর্মীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের দ্বিধার আরও একটা কারণ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট পণ্যের যদি যথেষ্ট পরিমাণে চাহিদা থাকে তবে তার জোগান দিতে এবং সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতিগুলির পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার ঘটাতে পুরো তিনটে শিফ্‌ট কাজ করা দরকার। তার মধ্যে রাতের শিফ্‌টও থাকবে। কিন্তু এ দেশের রাতে মহিলাদের পক্ষে যাতায়াত করাটা যে কতখানি বিপজ্জনক তা আর নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার নেই। গত ২০১২-র ডিসেম্বর দিল্লির রাস্তায় ফার্মাসির ছাত্রীটির ওপর নৃশংস ধর্ষণ ও তার হত্যার ঘটনা এখনও আমাদের বাকরুদ্ধ করে দেয়। দেশের রাজধানী শহরের প্রকাশ্য জনপথে মহিলাদের নিরাপত্তার যদি এই হাল হয় তাহলে দেশের অন্যান্য অংশের কথা আর না বলাই ভালো। কলসেন্টার এবং তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে তাদের কর্মীদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা বা বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়ি অথবা মিনিবাসের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু উৎপাদন সংস্থাগুলির হাতে মুনাফা এত কম থাকে যে তাদের পক্ষে কর্মীদের পরিবহণের জন্য এই বিপুল ব্যয় করা সম্ভব নয়। এমনকী যে সমস্ত কলসেন্টার কর্মীদের যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, ২০১২ সালের ডিসেম্বরের ওই নৃশংস গণধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর দিল্লি ও আশপাশের কলসেন্টারগুলিতে মহিলাদের উপস্থিতির হার চোখে পড়ার মতো কমে গেছে। অ্যাসোচ্যামের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষত রাতেরবেলায় জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাবও দক্ষ কর্মী হয়ে ওঠার পথে মহিলাদের কাছে বড় অন্তরায়।

'উইমেনস রোল ইন ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট' (১৯৭০, নিউইয়র্ক, সেন্টমার্টিন প্রেস) শীর্ষক এক মৌলিক গবেষণায় এস্টর বোসরূপ দেখিয়েছেন যে, মাতৃত্বকালীন ছুটি বা ক্রেশের বন্দোবস্ত করার নিয়মাবলি মহিলাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এই যুক্তি ধোপে টেকে না। এই জাতীয় বিশেষ সুবিধার আর্থিক দায়িত্ব এই সুবিধাগুলি যাঁরা নিচ্ছেন সেই সব মহিলা কর্মীর নিয়োগকর্তাদের বদলে সমস্ত নিয়োগকর্তার মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে আলাদাভাবে তাদের সংস্থায় মহিলা কর্মী আছে কি নেই সেই প্রশ্ন বিবেচনাই করা হয় না (১৯৭০ : ১১৩)। গবেষণাপত্রে তিনি আরও বলেছেন যে, কাজের ক্ষেত্রে মহিলাদের ওপর বৈষম্যের এত অভিযোগ সত্ত্বেও আর্থিক সমতা বিধানের এই সূত্র যদি মেনে না নেওয়া হয় তাহলে বুঝতে হবে যে অন্য কোনও গোপন কারণে শিল্পক্ষেত্রে মহিলাদের নিয়োগ বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে।

দিল্লির ওই ভয়াবহ ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের পর অনেককেই বলতে শোনা গিয়েছিল যে রাতেরবেলা মেয়েদের রাস্তাঘাটে বেরোনোর কী দরকার? অর্থাৎ জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার বদলে তাঁরা মেয়েদের ঘরে বসে থাকার উপদেশ দিচ্ছেন। এই উপদেশ মেনে চলতে গেলে তো মহিলাদের পক্ষে দক্ষতা-নির্ভর চাকরি বা পেশায় আসা সম্ভবই হবে না।

দক্ষ মহিলা কর্মীদের কর্মজগতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত করতে গেলে প্রধান তিনটি প্রতিবন্ধকতার কথা মাথায় রাখতে হবে। প্রথমত, শিশুর পরিচর্যার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যবস্থাপনার অভাব, যার ফলে গর্ভধারণের সময় মহিলারা কাজ ছাড়তে বাধ্য হন। দ্বিতীয়ত, মহিলা কর্মীদের নিয়োগ করার ফলে বাড়তি ব্যয়ভার বহনে নিয়োগকর্তার অনীহা। তৃতীয়ত, রাস্তাঘাট, বিশেষত, রাতেরবেলায় মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব। এই সমস্যাগুলি নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে সমাধানসূত্র খুঁজে পেতে দেরি হবে না।❑

[লেখক নতুন দিল্লির ইনস্টিটিউট ফর হিউমান ডেভেলপমেন্ট-এর বহিরাগত অধ্যাপক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরাগত গবেষক।

email : nathandev@hotmail.com]

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে দক্ষতা

উদ্ভাবন ও মিশ্রিত দক্ষতার আগামী দশক

ভারতীয় অর্থনীতিতে দারিদ্র ও বেকারত্বের প্রভাব বহুচর্চিত। এ জন্য দেশের বিপুল জনসংখ্যাকেই এতদিন দায়ী করে আসা হয়েছে। কিন্তু এই জনবিস্ফোরণই আশীর্বাদে পরিণত হতে পারে যদি দক্ষতার বিকাশের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়কে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা যায়। সেই প্রয়াসের খুঁটিনাটি এবং একে সফল করে তোলার আবশ্যিক শর্তগুলির পরিচয় রয়েছে **পূজা গিয়ানচন্দানি***-র এই নিবন্ধে।*

১৯ বছরের সঞ্জিতা নায়েক দক্ষিণ ওড়িশার আদিবাসী অধ্যুষিত রায়াগাড়া জেলার বাসিন্দা। সঞ্জিতার বাবা একজন কৃষিশ্রমিক। তাঁর একার উপার্জনের ওপরেই নির্ভরশীল সাত জনের পরিবার। দারিদ্র ও দুরবস্থার কারণে ছেলেমেয়েরা স্কুলের পাট চুকিয়ে দিয়েছে। সঞ্জিতা ছোটবেলা থেকেই বেশ ডাকাবুকো। অল্প বয়সেই সে তার প্রেমিকের সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায়। কিন্তু বিয়ের ৬ মাসের মধ্যেই সেই প্রেমিক সঞ্জিতার ওপর অত্যাচার চালিয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেল। সঞ্জিতা যখন খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের খোঁজে দিশাহারা, তখন তার বাবা-মা তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। পরিত্যক্ত সঞ্জিতা বাঁচার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে, বহুবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে সে। তাতেও সফল না হয়ে শেষপর্যন্ত মাওবাদীদের দলে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে থাকে সে। সৌভাগ্যবশত এই সময়েই এমন একজনের সঙ্গে দেখা হয় সঞ্জিতার, যিনি তাকে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে যোগ দেবার কথা বলেন, যেখান থেকে সে কাজ পেতে পারে।

যুব সম্প্রদায়ের জন্য একটি আবাসিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করে সঞ্জিতা। এখানে বিনামূল্যে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এমনকী, স্কুলছুটরাও এতে যোগ দিতে পারে। সঞ্জিতা সেলাইয়ের কাজ বেছে নেয়। সে কখনও সেলাই মেশিনে হাত দেয়নি, পোশাকের কার্টিং সম্বন্ধে তার কোনও ধারণাই নেই, কিন্তু ভারত সরকারের এই বিনামূল্যের প্রশিক্ষণ শিবির তাকে নতুন জীবন দিল।

সঞ্জিতাকে অবশ্য অনেক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। চোখের পরীক্ষা, হাত-চোখের সমন্বয়, যন্ত্রপাতি চেনা, সে রং-কানা কি না—নানাভাবে যাচাই করা হয় তাকে। নির্বাচিত হওয়ার পর আবাসিক শিবিরে সঞ্জিতা তার মতো আরও অনেক মেয়েকে দেখতে পেল। আশপাশের গ্রামের এই সব মেয়েরাও চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়ে সুরাহার আশায় সেখানে এসেছে। সঞ্জিতা এখানে দিনে তিনবার খেতে পেত, যা তার কাছে বিলাসিতারই নামান্তর। ক্রমশ সঞ্জিতা মেশিন চালাতে শিখল। তাকে নিয়মিত কাজ ও প্রজেক্ট ওয়ার্ক দিতেন প্রশিক্ষকরা। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে শৌচাগার ও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল। ক্লাস নেওয়া হতো স্বাস্থ্যবিধি, ইংরাজি ভাষা এবং ইন্টারনেটেরও। ৪৫ দিনের মধ্যে সঞ্জিতা মেশিন চালানোয় পারদর্শী এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পোশাক তৈরিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। তামিলনাড়ুর তিরুপুরের প্রসিদ্ধ রপ্তানি সংস্থা, কটন ব্লুসম থেকে চাকরির ডাক পেস সে। বেতন মাসিক ৮০০০ টাকা, সেইসঙ্গে বিনামূল্যে খাবার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। রায়াগাড়া থেকে চাকরিস্থলে যাবে বলে জীবনে প্রথমবার ট্রেনে চড়ল সে। এত বড় একটা সংস্থায় সে কাজ করতে চলেছে আর সবাই তার সঙ্গে এত ভদ্র ব্যবহার করছে—বিশ্বাসই হচ্ছিল না সঞ্জিতার। প্রথম মাসের মাইনে থেকে সঞ্জিতা পরিবারের সকলের জন্য চপ্পল কিনল। আসলে এর আগে ওরা কখনও জুতো পায়ে দেয়নি। এবারের গ্রীষ্মে, তার বাবা বাড়ির ছাদ মেরামত করালেন। দীপাবলিতে সঞ্জিতা যখন বাড়ি ফিরল, নতুন রং করা, আলোয় সাজানো বাড়ি দেখে তার মন ভরে গেল। সবাই সাগ্রহে স্বাগত জানাল বাড়ির মেয়েকে।

না, সঞ্জিতা গল্পকথার কোনও চরিত্র নয়। সে ওড়িশার রায়াগাড়ার IL & FS Institute of Skills-এর একজন শিক্ষার্থী। সে দক্ষ ভারতের মূর্ত প্রতিচ্ছবি। দক্ষ ভারত অভিযানে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সুসমন্বিত উদ্যোগ যে অসংখ্য মানুষের জীবন পালটে দিয়েছে, সঞ্জিতা তাদেরই একজন। এই মিশন কীভাবে চলা উচিত, কীভাবে শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা ও নিয়োগকর্তাদের চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যাওয়া যায়, সঞ্জিতার জীবন তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ। এটা আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেয় যে, ভারতে দক্ষতা বিকাশ সংক্রান্ত কর্মসূচি কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি শিল্পে ও শহরাঞ্চলে সীমায়িত রাখলে চলবে না। বাজারচালিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে উঠতে হবে একে।

সঞ্জিতা IL & FS-এর সাড়ে চার লক্ষ শিক্ষার্থীর একজন। এখানে জীবিকা-নির্ভর দক্ষতা বিকাশের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এখানকার শিক্ষার্থীদের ৪৭ শতাংশই মহিলা, অনেকেই স্কুলছুট। তাদের সামাজিক ও

শিক্ষাগত প্রেক্ষাপট বিভিন্ন ধরনের। IL & FS-এর বহুমুখী এই দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি দেশের ২৫টি রাজ্যে চলছে। এর মধ্যে উগ্র বামপন্থা প্রভাবিত ১০টি রাজ্য যেমন রয়েছে, তেমনি আছে জম্মু-কাশ্মীর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাগুলিও।

অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচি বিকাশের সহায়ক

রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী, ভারতে যুব জনসংখ্যা সবথেকে বেশি। এ দেশের ৮৮ কোটি ৩০ লক্ষ অধিবাসীর বয়স ৩৫ বছরের নীচে, যা মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ। চীনে এই হার মাত্র ৪৭ শতাংশ। দুঃখের বিষয় হল, এখানে যুব বেকারত্বের হার ১২.৯ শতাংশ। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাবমতো ২০১৪ সালে ভারতে ১৭ কোটি ৯৬ লক্ষ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে। এঁদের আয় দিনে ১ ডলারেরও কম। ভারতের জনসংখ্যা, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৭.৫ শতাংশ। অথচ বিশ্বের দরিদ্র মানুষের ২০.৬ শতাংশের বাস ভারতে। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যের বাসিন্দাদের এক-চতুর্থাংশেরও বেশি দারিদ্রসীমার নীচে। অর্থাৎ আমাদের বিপুল পরিমাণে তরুণ, উৎপাদনশীল মানবসম্পদ থাকলেও বেকারত্বের জন্য তা সঠিকভাবে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এর প্রভাব পড়ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। ক্রমশই তা আরও জটিল হয়ে উঠছে, জন্ম হচ্ছে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের।

যুব সম্প্রদায়ের সিংহভাগেরই কোনও প্রশিক্ষণ নেই। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তো দূরের কথা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের কাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার সুযোগও তারা পায় না। প্রতি দশ জন স্নাতকের একজন উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে। কিন্তু বেসরকারি কলেজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে ডিগ্রি লাভের পরও তাদের অনেকেও বেকার থেকে যায়। ভারতীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার বিভাজিত রূপ এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একদিকে সেইসব তরুণ-তরুণীরা, যারা কাজ চায় কিন্তু দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়নি। অন্যদিকে আর একদল তরুণ-তরুণী, যারা শিক্ষাগতযোগ্যতা অর্জন করেছে, কিন্তু সেই যোগ্যতা তাদের কাজ দিতে অপারগ।

সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের অপরিহার্য শর্ত হল, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের যুব সম্প্রদায়কে এর অন্তর্ভুক্ত করা। 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মন্ত্রে শিল্পজগৎ এখন সঞ্জীবিত। কিন্তু কেবলমাত্র সংগঠিত ক্ষেত্রের পক্ষে বিপুল এই শ্রমশক্তিকে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্বচ্ছ ভারত, নমামি গঙ্গে এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কর্মসূচির জন্য প্রচুর সংখ্যায় দক্ষ পেশাদার প্রয়োজন। অসংগঠিত ক্ষেত্রের বহু শ্রমিককেও এখন উস্তাদ, লার্ন অ্যান্ড আর্ন প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। এই প্রথম অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরও স্বীকৃতি দেবার একটা প্রয়াস হাতে নেওয়া হল।

দক্ষতা বিকাশের বাস্তুতন্ত্রের পরিচর্যা

কেন্দ্রীয় সরকার বেসরকারি ক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন, বিশ্ব ব্যাংক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, OECD প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দক্ষতা বিকাশের কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ মন্ত্রকের

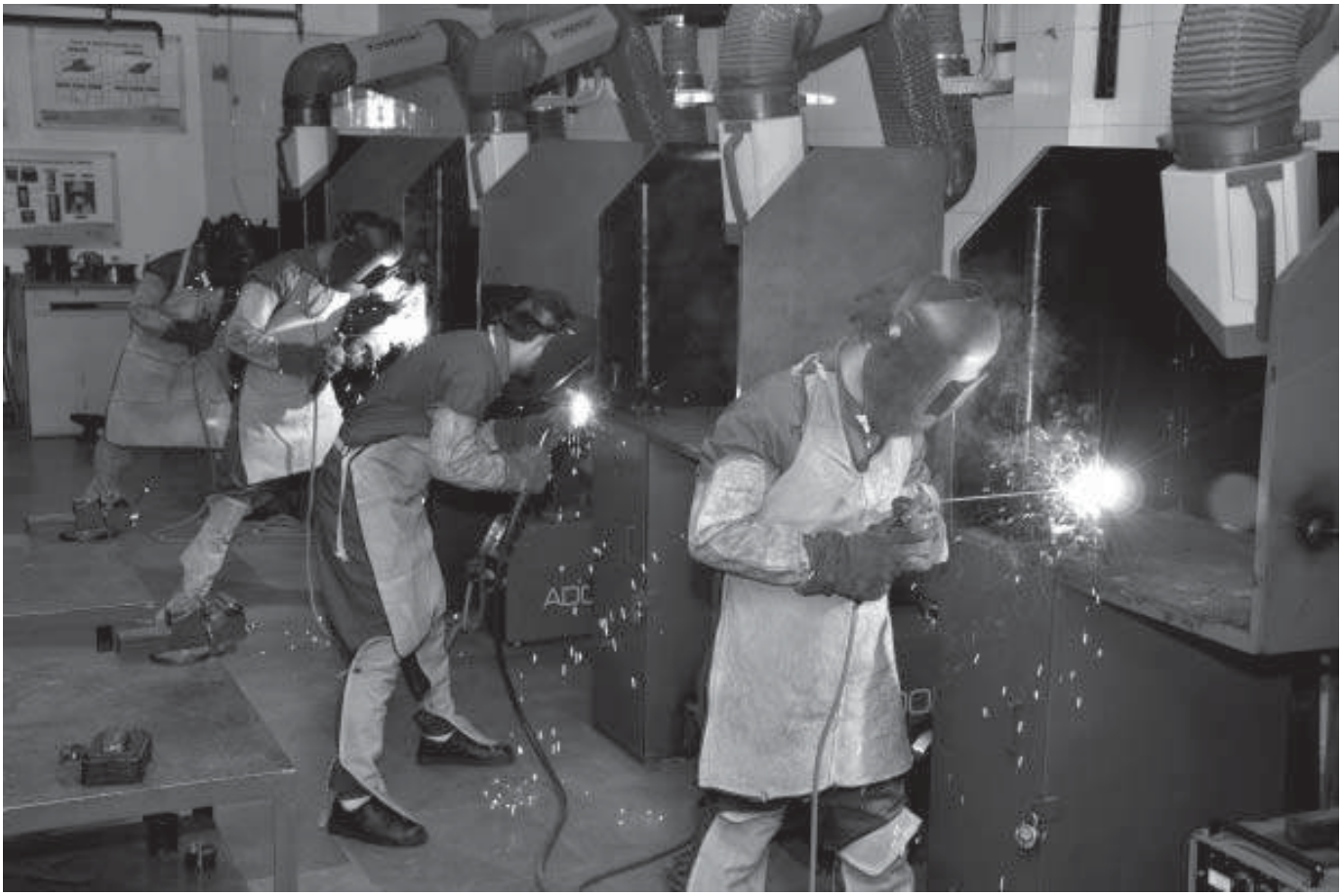

পরিচালনায় এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ২০টিরও বেশি দপ্তর। দেশের প্রত্যন্ততম অঞ্চলের বাসিন্দারাও যাতে কাজের মূল ধারায় সংযুক্ত হতে পারেন, সেদিকে লক্ষ রেখে বড়সড় মাপের বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের গ্রামীণ কৌশল্য যোজনা এবং বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের সংযুক্ত দক্ষতা বিকাশ প্রকল্প। এর আওতায় গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় প্রান্তিক অবস্থানে থাকা তরুণ-তরুণীদের গোষ্ঠী গঠন করে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণের সুবিধা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে অনগ্রসর এলাকা, পাহাড়ি এলাকা, উগ্রপন্থা প্রভাবিত ও সংঘর্ষদীর্ণ এলাকায়। বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে সংখ্যালঘু, মহিলা এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের এর আওতায় আনতে।

বহু বেসরকারি সংস্থা এই উদ্যোগে তাদের ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির রূপায়ণ, ক্ষেত্রভিত্তিক দক্ষতা পরিষদ গঠন এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চ ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের দক্ষতা তুলে ধরার মতো কাজে শিল্পমহলকে সংহত করার দায়িত্ব পালন করছে জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগম—NSDC। ৩৫টিরও বেশি ক্ষেত্রের কর্পোরেট সংস্থা, ক্ষেত্রীয় দক্ষতা পরিষদের সঙ্গে একযোগে জাতীয় দক্ষতা যোগ্যতা কাঠামোর আওতায় জাতীয় পেশাগত মান নির্ধারণের কাজ করছে। ভবিষ্যতে এটিই হবে কোনও তরুণের কাজের পৃথিবীতে প্রবেশের ছাড়পত্র। দক্ষ ভারত গড়ার কাজে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষ যাতে নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য একটি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলারও প্রয়াস চালাচ্ছে তারা।

গত কয়েক বছরে দক্ষতার বাস্তুতন্ত্রের প্রসার ঘটেছে অভাবনীয় দ্রুতগতিতে। এর মাত্রা ও জটিলতা ক্রমশ বেড়েছে। সে জন্যই একজন শিক্ষার্থীকে কাজের জন্য তৈরি করে তোলার সময়ে তার নিজস্ব শিক্ষাগত চাহিদার কথা মাথায় রাখা দরকার।

বাজারচালিত দক্ষতা কর্মসূচি

দক্ষতা সংক্রান্ত যে কোনও প্রয়াসের মূল কথা হল শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা গড়ে তোলা। এ জন্য উচ্চমানের প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। আর তা সুনিশ্চিত করতে হলে বহুবিধ প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির অংশীদারিত্ব একান্ত আবশ্যক। কাজের ভূমিকাকে কেন্দ্রে রাখলে এমন এক সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হয়, যেখানে শিক্ষার্থী সঠিক সময়ে সঠিক সুযোগ তো পায়-ই, উপরন্তু শিল্পের বিকাশের সঙ্গে তারও উত্তরণ ঘটে। ভারতে বর্তমানে দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে যে সব প্রয়াস চলছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

(ক) শিল্পমহলের অংশীদারিত্ব :

কাজ ও শ্রমশক্তির সেতু হল দক্ষতা। হিসাব করে দেখা গেছে, ২০১৩ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে বস্ত্রবয়ন, ইঞ্জিনিয়ারিং, নির্মাণ, পরিষেবা প্রভৃতির মতো উচ্চ বিকাশশীল শিল্পে ১২ কোটি ৮ লক্ষ দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন হবে। শিক্ষা ও বিনিয়োগের চালিকাশক্তি হবে কর্মসংস্থান। নিয়োগকর্তাদের এ ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মিশ্রিত শিক্ষণ মডেল

মিশ্রিত শিক্ষণকে শিক্ষকের ভূমিকা, বাস্তব এলাকা, সরবরাহ পদ্ধতি এবং ক্রমপর্যায় অনুসারে ৬টি মডেলে ভাগ করা যায়। তবে এর নতুন নতুন সংস্করণ প্রতিনিয়ত প্রকাশ পাওয়ায় এগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তনশীল। নীচে এই মডেলগুলির প্রাথমিক বিভাজনের পরিচয় দেওয়া হল।

মুখোমুখি শিক্ষাদান

বেশির ভাগ পাঠক্রমেই এই মডেল অনুসরণ করা হয়। শিক্ষক, টেকনোলজি ল্যাবে অনলাইন অথবা ক্লাসরুমে সরাসরি শিক্ষাদান করেন।

আবর্তন

কোনও নির্দিষ্ট পাঠক্রমে ছাত্র-ছাত্রীরা অনলাইন প্রশিক্ষণ ও ক্লাসরুম প্রশিক্ষণের মধ্যে যাওয়া-আসা করতে পারে।

ফ্লেক্স

অনলাইনে শিক্ষক কোনও একজন বা ছোট কোনও গ্রুপকে প্রয়োজনমতো সাহায্য করেন।

অনলাইন ল্যাব

অনলাইনে শিক্ষাদান করা হলেও এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি স্থান থাকে। সাধারণত যেসব ছাত্রছাত্রী অনলাইন ল্যাবে শিক্ষাগ্রহণ করে, তারা প্রথাগত পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে।

নিজস্ব মিশ্রণ

স্কুলের প্রথাগত পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক ছাত্র অনলাইনে শিক্ষাগ্রহণ করে। বিশেষত হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

অনলাইন ড্রাইভার

এটি একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। শিক্ষকের সহযোগিতায় ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণ করে। সামনাসামনি মূল্যায়নের সুবিধাও থাকে, কিছু ক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক।

ক্ষেত্রীয় দক্ষতা পরিষদের অনুমোদিত সংস্থা থেকে পাশ করলে তবেই যাতে শ্রমিকদের নিয়োগ করা হয়, তা তাঁদের সুনিশ্চিত করতে হবে।

(খ) পরিকাঠামো :

বর্তমান দক্ষতা বিকাশ কর্মসূচিগুলির প্রধান সীমাবদ্ধতা হল এর পরিকাঠামোগত দুর্বলতা এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শহর ও গ্রামীণ এলাকায় এগুলি পৌঁছে দিতে না পারা। এই দুর্বলতা দূর করতে ১৪ হাজারেরও বেশি সরকারি ও বেসরকারি ITI, জাতীয় দক্ষতা বিকাশ নিগমের ২০০-র বেশি অংশীদার, প্রধান মন্ত্রকগুলির সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে দেশের কোণে কোণে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিগুলি পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। হাজার হাজার বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ। এগুলির মধ্যে কিছু প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতে শেখানো হয়। এর প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই আরও গভীর। তবে প্রযুক্তিগত অগ্রসরতা এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল শিল্পের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প এলাকার সঙ্গেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (উদাহরণ—শিল্প তালুক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, স্মার্ট সিটি) অথবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে কাজের জায়গা থাকা (উদাহরণ—ITI, পলিটেকনিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস) জরুরি হয়ে পড়েছে।

(গ) প্রযুক্তি :

শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষকের অভাব এবং বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। ২০২২ সালের মধ্যে ৩০ কোটি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দিতে ভারতে অন্ততপক্ষে ১ কোটি দক্ষ প্রশিক্ষক প্রয়োজন। নিজস্ব বিষয়ে জ্ঞান ছাড়াও তাঁদের মধ্যে ক্লাস পরিচালনা, হাতে-কলমে বিষয়টি উপস্থাপনার দক্ষতা প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ব্যবহারের জ্ঞান প্রভৃতি থাকতে হবে। ঝাড়খণ্ডের গভীর জঙ্গল, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, জম্মু-কাশ্মীরের মতো যে সব জায়গায় শিক্ষক পাওয়া মুশকিল, সেখানে তাঁদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষতা, তাই শিক্ষকদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক।

এরপর কী

২০২২ সালের মধ্যে ৫ কোটি মানুষকে ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর হার ২০১৩ সালে ছিল ২৯ শতাংশ। তিন বছরের মধ্যে এই হার ৫০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। মহিলা ব্যবহারকারীর হার ২০১৩ সালের ২৮ শতাংশ থেকে ২০১৮ সালে ৩৫ শতাংশ হবে বলে ধরা যায়। এর ফলে শুধু বিনোদন নয়, প্রসার ঘটবে শিক্ষারও। দক্ষ ভারতের সঙ্গে হাতে হাত ধরে হাঁটবে ডিজিটাল ইন্ডিয়া এবং মেক ইন ইন্ডিয়া। শিক্ষার অনলাইন ও মোবাইল প্ল্যাটফর্মের সংখ্যা আরও বাড়বে। কিন্তু প্রশ্ন হল, কেবল স্থির পরিকাঠামো ব্যবহার করেই কি দক্ষতার সঞ্চার সম্ভব? উত্তরটা বোধহয় না। তাই যেকোনও ক্ষেত্রের বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে আরও বেশি প্রায়োগিক ও উদ্ভাবনী করে তুলতে হবে। অনলাইন পাঠ্যসূচি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার সুবিধামতো জায়গা থেকে সর্বক্ষণ এর নাগাল পেতে পারে।

TVET-র মিশ্রিত শিক্ষণ পদ্ধতি মুখোমুখি শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটাবে। রেল স্টেশন, মেট্রো স্টেশন, শপিং মলের মতো জনবহুল এলাকায় এর কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। 'Skills on Wheels' এই কর্মসূচিতে বিপুল মূল্য সংযোজন ঘটাতে পারে।

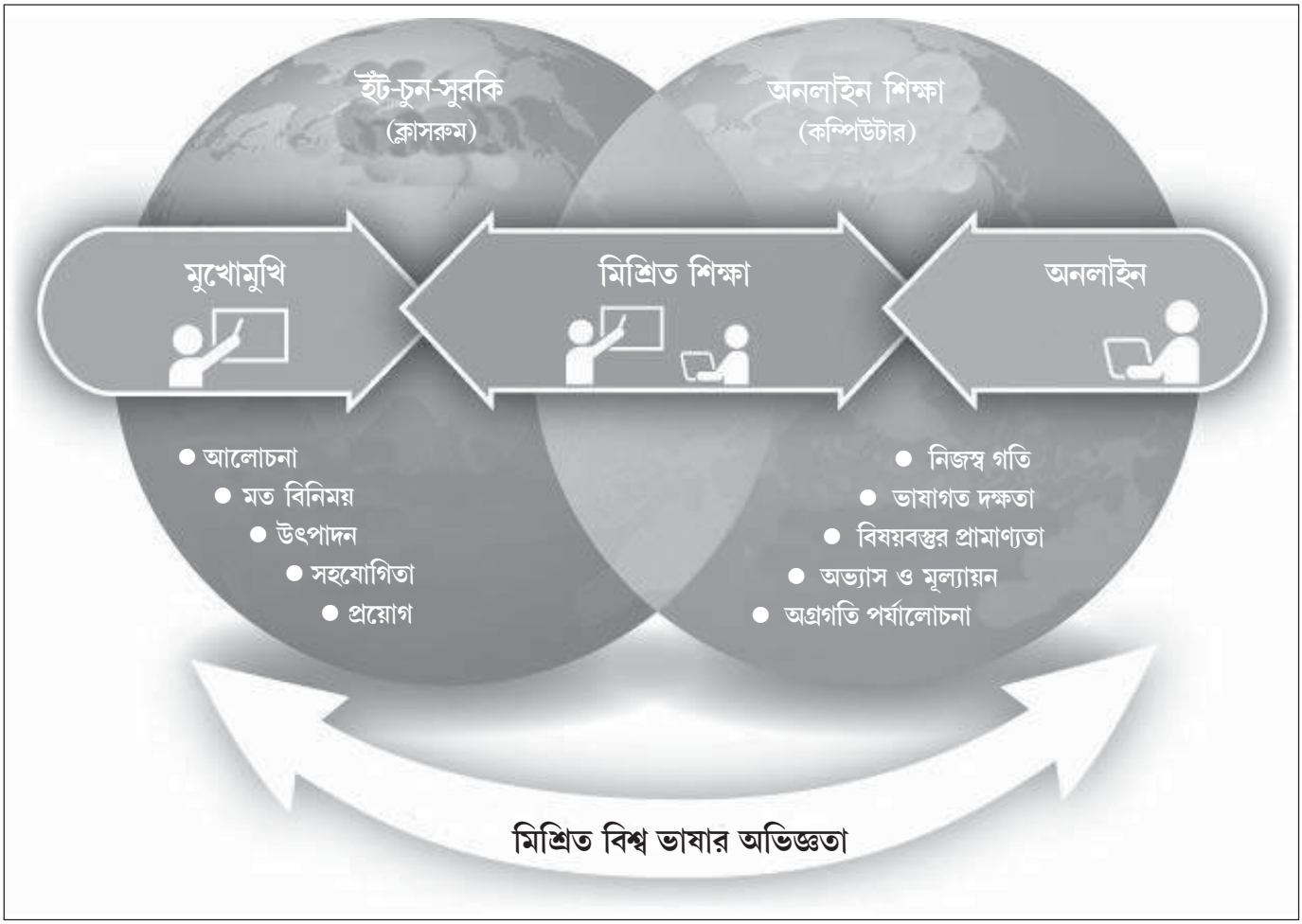

ব্রাজিলে এভাবেই Skill Truck-এর মাধ্যমে SENAI, দক্ষতা প্রশিক্ষণকে দেশের গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে পৌঁছে দিয়েছিল।

মিশ্রিত শিক্ষণ পদ্ধতি, দক্ষতা বিষয়ক মডেলগুলির আত্মসমীক্ষাতেও সহায়ক হবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি ও নিয়োগকর্তারা দক্ষতাকে 'উৎপাদন' হিসাবে না দেখে 'পরিণতি' হিসাবে দেখবেন। সরকার বা বেসরকারি ক্ষেত্র, বিনিয়োগ যারাই করে থাকুন, তাঁরা বিনিয়োগের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেখবেন। সঞ্জিতার কথাই ভেবে দেখুন না। দক্ষতার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার ক্ষমতায়ন শুধু তার অর্থনৈতিক অবস্থারই নয়, উত্তরণ ঘটিয়েছে তার পরিবার, গোষ্ঠী ও গ্রামেরও।

উপসংহার

শিল্পের মানবসম্পদগত চাহিদা এবং এই চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো—দক্ষ ভারত অভিযানে এই দুদিকেই খেয়াল রাখতে হবে। প্রশিক্ষণের মান, মূল্যায়ন এবং কর্মসংস্থানের উন্নয়নে দক্ষতা সংক্রান্ত তিনটি I-এর ওপর জোর দিতে হবে। Investment বা বিনিয়োগ, Innovation বা উদ্ভাবন এবং Institution বা প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে শিল্প-নির্ভর বা প্রশিক্ষণ মডেল বেরিয়েছে, যেগুলি অত্যন্ত সফল। এখানে শিক্ষার্থীকে কোনও নির্দিষ্ট শিল্পের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তি এই সব ক্ষেত্রে মূল সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছে। দক্ষতার বিকাশ, যুব সম্প্রদায়ের সামাজিক রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতা রাখে। দরিদ্র, অসহায় মানুষ, যাঁদের অনেকে স্কুলছুট, কিন্তু শ্রমের বাজারে প্রবেশ করতে চান, দক্ষতার প্রশিক্ষণ তাঁদের কাছে এক সেতুর মতো। তথ্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও অভিজ্ঞতা লাভের মাধ্যমে এটাই তাঁদের কাজ পাবার চাবিকাঠি।❑

[লেখক IL & FS এডুকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি সার্ভিসেস লিমিটেডের নীতি, যোগাযোগ ও কর্পোরেট সংযোগ বিষয়ক গ্রুপের বিভাগীয় প্রধান।
email : poojagianchandani@gmail.com]

দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার

দেশের যে বিপুল জনসংখ্যা এক সময় উদ্বেগের কারণ ছিল তা এখন আশীর্বাদ। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স যখন বাড়ছে তখন ভারতের জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরই বয়স ২৫ বছরের কম। জনবিন্যাসগত এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক বিকাশের হার ত্বরান্বিত করা তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার সুবর্ণ সুযোগ এসেছে ভারতের সামনে। দেশের যুব সম্প্রদায়কে কর্মনিযুক্তির উপযোগী করে গড়ে তোলা গেলে তবেই কিন্তু এই জনবিন্যাসগত সুযোগের সদ্ব্যবহার সম্ভব। কীভাবে তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতার সঞ্চার সম্ভব? পথ আছে একাধিক। প্রচলিত শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় দক্ষতা নাকি নতুন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের উপযোগী দক্ষতা অর্জন কোন পথে চললে আগামী দিনে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি? আলোচনা করেছেন **অধ্যাপক মনোজ যোশী, ড. অরুণ ভাদৌরিয়া** ও **ড. শৈলজা দীক্ষিত।**

ভারতের যুব সম্প্রদায় দেশের এক বড় সম্পদ। তাই আর্থিক বিকাশের সাহায্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে এ দেশে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। দুরকমভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। প্রথমত, যে প্রচলিত ব্যবস্থাপনা অর্থনীতিকে ধরে রেখেছে তার দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। দ্বিতীয়ত, স্বনিযুক্ত ও শিল্পোদ্যোগীদের গঠনমূলক কাজে দক্ষ করে তুলতে যদি এমন এক নতুন কাঠামো গড়ে তোলা যায় তাহলেও অর্থনৈতিক অর্থগতির ধারাকে অতিরিক্ত অক্সিজেন জোগানো যায়। এই দুই ধরনের ব্যবস্থারই সুবিধা-অসুবিধা রয়েছে যা নিয়ে এই নিবন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। তবে এই নিবন্ধে আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় দক্ষতা বৃদ্ধি। কর্মীদের যে দক্ষতা রয়েছে এবং দক্ষতার যে উন্নতি হচ্ছে কিংবা সহায়সম্পদের যে সদ্ব্যবহার ঘটছে তা যেন অর্থনৈতিক বিকাশ ও অগ্রগতির লক্ষ্যপূরণ করে তা সুনিশ্চিত করা কিন্তু সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ এবং তা থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা

সম্প্রতি কয়েক বছরে দারিদ্রমোচন ও তথা স্বত্বপ্রদানমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার সামুদায়িক বিকাশ অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের মানুষের উন্নয়নের বিপুল বিনিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছে। এই ধরনের কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন, জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি নিগম ইত্যাদি। এর পাশাপাশি দেশের সার্বিক বিকাশ তথা সমৃদ্ধির লক্ষ্য পূরণে নেওয়া হয়েছে 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র মতো উদ্যোগ। অর্থাৎ এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে একদিকে যেমন সর্বোচ্চ মাত্রায় সহায়সম্পদের সদ্ব্যবহার ঘটানো হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে নতুন নতুন সহায়সম্পদ চিহ্নিত করা হচ্ছে, আবার চাহিদাভিত্তিক গবেষণা ও উদ্ভাবনার মাধ্যমে কখনও কখনও এই নতুন সহায়সম্পদ সৃষ্টিও করা হচ্ছে।

'স্কিল ইন্ডিয়া' উদ্যোগ এই জাতীয় কর্মসূচির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জনসাধারণের জীবিকার নিরাপত্তা বিধান প্রসঙ্গে যে কোনও আলোচনাতেই প্রথমেই দক্ষতাভিত্তিক জ্ঞানার্জনের প্রশ্নটি এসে পড়ে। জীবিকাসূচকে সফল উদ্যোগ ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং বিভিন্ন উপায়ের সহজলভ্যতা ও তাতে প্রবেশাধিকারের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তা ছাড়া দক্ষতা বৃদ্ধি আপনা-আপনি হয় না। সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ও পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটাতে হয়। সমসাময়িক শিক্ষাবিদ ও নীতি প্রণেতাদের মধ্যে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিতর্কে শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট বা যাঁরা কোনও নতুন উদ্যোগে প্রারম্ভিক পুঁজি ঢালেন ও সেই সঙ্গে অন্যান্য লগ্নিকারীরা সাধারণত 'স্টার্ট আপ' বা একদম নতুন ধরনের উদ্যোগে লগ্নির ওপর জোর দেন যাতে বাণিজ্য জগতে এবং দক্ষতার প্রসার ও সমাজের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রগুলিতে আগে কখনও পা পড়েনি সেখানে সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহার ঘটানো যায়। কিন্তু এই উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও তেমন কোনও সফল উদ্যোগেরও যেমন সূচনা হচ্ছে না, তেমনই কর্মনিযুক্তির উপযুক্ত মানবসম্পদও তৈরি হচ্ছে না। সমাজের মানুষের দারিদ্র, দুর্দশা এবং তার থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা, আর্থিক বিকাশ তথা অর্থনৈতিক অগ্রগতিও সমৃদ্ধির লক্ষ্যপূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির ভূমিকা

প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত দক্ষতাকে এককথায় 'দক্ষতা বৃদ্ধি' বলা যেতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁদের জাতীয় নীতির মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রভাব ও ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দক্ষতা বৃদ্ধির

মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ বাজারের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেন এবং সেই সঙ্গে নতুন উদ্ভাবনা ও উদ্যোগমূলক কর্মকাণ্ডের সুফলও ভোগ করতে পারেন।

এমনিতে, দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কিছু প্রাথমিক শর্ত তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে বর্তমানে তীব্র প্রতিযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তনশীল অর্থনীতির নতুন নতুন চাহিদা মেটানোর সুবিধা-অসুবিধাগুলির কথা মাথায় রেখে নতুন করে এই নির্ণায়ক শর্তগুলি নিয়ে ভাবার সময় এসেছে।

কোনও একটি দেশে কত সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে বা তারা কতটা উৎপাদনশীল তার ওপরই কিন্তু দেশটির ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। এটা একটা এমন এক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি এখানে যে দেশ বাজারের ওঠাপড়া (ভোলাটিলিটি), অনিশ্চয়তা (আনসার্টেনটি), জটিলতা (কমপ্লেক্সিটি) এবং অস্পষ্টতা (অ্যাম্বিগুইটি) —এই চারটি বিষয়ের মোকাবিলা করতে পারবে সেই দেশকেই সবচেয়ে সফল বলে গণ্য করা হবে। তাই আর্থিক বিকাশ, কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের মতো গুরুতর প্রশ্নের সঙ্গে দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই কারণে এই বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপ একান্ত জরুরি।

প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতের সুবিধাজনক অবস্থান

বস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ-এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বজুড়ে ৪ কোটি ৭০ লক্ষ কর্মীর ঘাটতি দেখা দেবে। কিন্তু সেই সময় আর্থিক বিকাশের ঊর্ধ্বমুখী হার এবং জনসংখ্যা বিন্যাসের পুরো সুযোগ নিতে পারবে ভারত। ভারত বিশ্বের নবীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অন্যতম এবং বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যার ৬২ শতাংশের বেশিই রয়েছেন কাজের উপযোগী ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়ঃসীমার মধ্যে। দেশের মোট জনসংখ্যার ৫৪ শতাংশের বেশি মানুষের বয়স ২৫ বছরের কম। ২০২২ সালের মধ্যে এ দেশে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ কর্মী উদ্বৃত্ত হবে। এমনকী বর্তমানের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ দেশে প্রতি বছর ১ কোটি ২০ লক্ষ তরুণ-তরুণী কাজের বাজারে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে যাদের উপযুক্ত দক্ষতা ও শিক্ষা রয়েছে তারা মূল্যবান মানবসম্পদ হিসাবে শুধু ক্রমবিকাশশীল ভারতীয় বাজারই নয়, বরং বিশ্ব অর্থনীতির চাহিদাও পূরণ করতে পারবে (যোজনা কমিশনের নীতি সংক্রান্ত নথি, দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী যোজনা)।

এশিয়ার আরও অনেক দেশের মতো ভারতের শ্রম বাজারও পাঁচ রকম সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। যথা, কৃষি থেকে অকৃষি বা কৃষি ছাড়া অন্যান্য কর্মকাণ্ড, গ্রামীণ থেকে নাগরিক, অসংগঠিত থেকে সংগঠিত ক্ষেত্র, গ্রাসাচ্ছাদনমূলক স্বনিযুক্তি থেকে ভদ্রস্থ পারিশ্রমিকমূলক কর্মসংস্থান এবং বিদ্যালয় থেকে কাজের বাজার।

ভারতের যে বিপুল জনসংখ্যাকে আগে অভিশাপ বলে মনে করা হত, এখন তাই আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে শুধু জনসংখ্যা বাড়লেই জনবিন্যাসগত সুবিধা বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড পাওয়া যাবে না। দক্ষ, শিক্ষিত এবং কর্ম নিযুক্তির উপযুক্ত জনসাধারণ থাকলে তবেই একটি দেশের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। সস্তা শ্রম এবং বিপুল সংখ্যক দক্ষ ও প্রতিভাবান কর্মীরই বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতার বাজারে ভারতকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় রেখেছে এবং সেই সঙ্গে একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার পথেও সহায়ক হয়ে উঠেছে (সবরওয়াল, ২০১৩)।

দক্ষতার ঘাটতি পূরণ : ভারতে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা

একদিকে বিশ্বজুড়ে জনসংখ্যার গড় বয়স যখন দ্রুত বাড়ছে তখন ভারত তার যুব সম্প্রদায়ের বলে বলীয়ান হয়ে কৌশলগত দিক থেকে অনেক সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তবে এ দেশের জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশই অদক্ষ। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম) গ্লোবাল ট্যালেন্ট রিস্ক প্রতিবেদনে (২০১১) বলা হয়েছে যে, প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকার দরুন ভারত ও ব্রাজিলের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কর্ম নিযুক্তির উপযুক্ত কর্মী অমিল হয়ে পড়বে। শিল্পমহল যে কর্মীদের মধ্যে যে দক্ষতা চায়, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তা অর্জন করা যায় না। 'জাতীয় দক্ষতা বৃদ্ধি মিশন' (ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিশন)-এর যাবতীয় প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ২০২২ সালের মধ্যে ৫০ কোটি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণ নেহাত সহজ কাজ নয়।

এ ক্ষেত্রে আর্থিক বিকাশ এবং সুযোগের সদ্ব্যবহারের মধ্যে কিছু ব্যবধান রয়ে গেছে যেমন,

(১) অপেক্ষাকৃত অনুন্নত দেশগুলিতে (লেস ডেভেলপড কান্ট্রি বা LDC) জীবিকা বা কর্মসংস্থান ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত বিভিন্ন ত্রুটি যেমন, সহায়সম্পদের অসম বণ্টন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতে বিভক্ত জমি, বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাধাদানের প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ই সেখানকার মানুষজনের দারিদ্র, আর্থিক অনগ্রসরতার মূল কারণ। আর এই বিষয়গুলি সেখানকার অর্থনৈতিক বিকাশের পথে মূল অন্তরায়।

(২) পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চাষবাস করে ফসলের বৈচিত্রসাধনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদনে স্থিতিশীলতা আনা, প্রাকৃতিক সহায়সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বণ্টন ব্যবস্থার ফাঁকফোঁকরগুলিকে মেরামত করা তথা ব্যয়সাশ্রয়ী ও বাণিজ্যমুখী ব্যবস্থা গ্রহণে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া এখন একান্ত প্রয়োজন (যেমন, মাটি ও জল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে)।

(৩) স্বয়ম্ভর ব্যবস্থা (যেমন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলার কর্মকাণ্ড) গড়ে তোলার লক্ষ্যপূরণে উপার্জনের জন্য বিকল্প কাজকর্মের উদ্যোগ গ্রহণ।

(৪) পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত দিক থেকে উপযোগী তথা বিশ্বের বাজার ও সেই সঙ্গে অবশ্যই স্থানীয় পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে মানানসই পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব (যেমন, বিভিন্ন ঋতুর পক্ষে উপযোগী কৃষি ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান)।

(৫) বিভিন্ন বিপর্যয়ের সময় মজুত ভাণ্ডারগুলি থেকে জোগান নিশ্চিত করতে ঘটনাস্থলেই মজুত সামগ্রীর তত্ত্বাবধান ও বিভিন্ন উদ্যোগ রূপায়ণের ক্ষেত্রে দক্ষতার উন্নতি সাধন।

স্থানীয় জনসম্প্রদায়কে শামিল করে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য সম্পদ ও লজিস্টিকস বা রসদ জোগানের ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন।

চাহিদা ও জোগানের যোগসূত্র স্থাপনের সমস্যা

বেকার মানুষের সংখ্যা দিয়ে যেমন কত সংখ্যক ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করবে তা পুরোপুরি বোঝা সম্ভব নয়, তেমনই শূন্য পদের সংখ্যা দিয়ে চাকরির জোগান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া অসম্ভব (ডায়মন্ড, ২০১১)। কর্মসংস্থান ও উৎপাদনশীলতার প্রকৃতির মধ্যে একটা চোখে পড়ার মতো গরমিল রয়ে যায়। এ দেশের মোট কর্মীবাহিনীর ৯৩ শতাংশই কাজ করেন অপ্রথাগত ক্ষেত্রে। এই অপ্রথাগত ক্ষেত্রের উদ্যোগগুলির হাল অত্যন্ত শোচনীয়। এর ফলে এগুলির উৎপাদনশীলতাও খুবই কম। কর্মীবাহিনীর ৫৮ শতাংশ কাজ করেন কৃষিক্ষেত্রে। অথচ দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি-তে এই কৃষিক্ষেত্রের অবদান মাত্র ১৫ শতাংশ। আবার মোট কর্মীবাহিনীর মাত্র ১২ শতাংশ উৎপাদনক্ষেত্রে নিযুক্ত, সেখানে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে শ্রমিকদের ৫০ শতাংশই উৎপাদনক্ষেত্রে কাজ করেন। আবার, সংগঠিতক্ষেত্রে এমন কিছু উৎপাদন ইউনিট রয়েছে সেখানে অপেক্ষাকৃত কম দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীদের নিয়েও কাজ চালানো যায়। এই ধরনের ইউনিটগুলি এমন একটি মধ্যবর্তী স্তর সৃষ্টি করবে যার ফলে কৃষি থেকে অকৃষিমূলক কাজে পা রাখার কঠিন কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। এ দেশের কর্মীবাহিনীর অর্ধেকেরও বেশি স্বনিযুক্ত। কিন্তু তার ফলে যে এ দেশে নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে জোয়ার এসেছে তা ভাবাটা ভুল। কারণ এই স্বনিযুক্ত ব্যক্তিদের অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র। তারা কাজ করে দিন গুজরান করে (ম্যাকিনসে, ২০১৪)।

নতুন করে যাঁরা শ্রম বাজারে প্রবেশ করছেন তাঁদের সংখ্যাটার ওপরই জোর দেন অধিকাংশ ব্যক্তি। যেমন, পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী কুড়ি বছরে প্রতি মাসে ১০ লক্ষ করে তরুণ শ্রমের বাজারে যোগ দেবে। যাঁরা নতুন করে যোগ দিচ্ছেন তাঁদের কথা নয় বাদ দেওয়া গেল। কিন্তু ইতিমধ্যেই শ্রমের বাজারে যে ২০ কোটি মানুষ কৃষিক্ষেত্রে বা অন্যত্র নিম্ন উৎপাদনশীলতার জালে আটকা পড়ে আছেন তাঁদের কী হবে? ২০১১ সালের তথ্যানুযায়ী, সরকার পরিচালিত ১,২০০টি কর্মসংস্থানকেন্দ্র মাত্র ৩ লক্ষ চাকরির ব্যবস্থা করতে পেরেছে। অথচ এই কর্মসংস্থানকেন্দ্রগুলিতে ৪ কোটি চাকুরিপ্রার্থীর নাম নথিভুক্ত রয়েছে (ম্যাকিনসে, ২০১৪)।

দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার পথে বাধা

ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীর চাহিদা পূরণের জন্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো উচিত এবং সেই মতো এই শিক্ষাব্যবস্থার মান বেঁধে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার কাছে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ছুট হয়ে পড়ার প্রবণতাটাই মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ছুট হয়ে পড়ার ঘটনা রীতিমতো এক উদ্বেগের কারণ। বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পর অন্তত ৩৫ শতাংশ শিক্ষার্থীই দশম শ্রেণি অবধি পৌঁছতে পারে না। এছাড়া যে ২ কোটি ৬০ লক্ষ শিক্ষার্থী দশম শ্রেণির পরীক্ষায় বসে তাদের মধ্যেই ১ কোটিই উত্তীর্ণ হতে পারে না। আবার দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ পরীক্ষার্থী বসে তাদের মধ্যে ৮০ লক্ষই এই গণ্ডি অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়। দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় বাকি যে ৮০ লক্ষ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় তাদের মধ্যে মাত্র ৫০ লক্ষই কলেজে যেতে পারে। তাই শিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীবাহিনী ও পেশাদারদের গড়ে তুলতে গেলে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষাব্যবস্থা নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয় এবং শিক্ষা সম্পন্ন করতে (সবরওয়াল, ২০১৩) পারে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষাব্যবস্থার গোড়ার দিকে যারা বিদ্যালয়ছুট হয় তাদের মধ্যে দরিদ্র ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশি এর ফলে তৃতীয়বর্গের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে নথিভুক্তির মধ্যে অসাম্যের চিত্রটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই কারণেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অবশ্যই সমাজের মূল প্রয়োজনগুলির কথা মাথায় রেখে উপযুক্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষামূলক পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা সৃষ্টি করতে হবে। তারপর জীবিকার প্রশ্নটি আবার অন্যান্য কিছু শর্তের ওপর নির্ভরশীল। যেমন—

১) বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়নের নিশ্চয়তা

২) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা (আয়, দক্ষতা ও সময়)

৩) পুষ্টিবিধানের নিরাপত্তা (আশ্রয়, মা ও শিশুর পরিচর্যা, জল ও স্যানিটেশন-সহ স্বাস্থ্য পরিষেবা)

৪) পরিবেশ সংক্রান্ত সচেতনতার নিরাপত্তা

৫) শিক্ষায় অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা

৬) জনসমষ্টির অংশগ্রহণ (নারী-পুরুষ, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠী)।

৭) বাসস্থানের নিরাপত্তা

৮) খাদ্যের নিরাপত্তা

৯) স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা

১০) রাজনৈতিক ও আইনি নিরাপত্তা।

মানবসম্পদ দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ কীভাবে আর্থিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করে

ঘাটতি পূরণের জন্য কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা—

(১) পিরামিডের একেবারে নীচের স্তরে বসবাসকারী জনসাধারণের দক্ষতা নতুন করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। মূলত উন্নত প্রযুক্তি নাগাল না পাওয়া এবং পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার অভাবে এ দেশে এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ কর্মী গড়ে তোলা যায়নি।

(২) কী ধরনের সুযোগ আসতে চলেছে তা আন্দাজ করে নেওয়া এবং সেই সুযোগ

নেওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে তুলতে দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু মৌলিক ধ্যানধারণা থাকা চাই।

(৩) সামগ্রিকভাবে দেশের তরুণ সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে যারা কোনও ধরনের বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত তাদের মধ্যে নতুন শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের দক্ষতা থাকা চাই।

দীর্ঘমেয়াদি ও স্থিতিশীল আর্থিক বিকাশ তথা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সুষম বণ্টনের প্রয়োজনে দক্ষতার বিকাশ ও তার যথাযথ দেখভাল এবং কাজে লাগানোর প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধনকে এখন নীতি রচনার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিষয় হিসাবে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওইসিডি স্কিলস স্ট্র্যাটেজিতে' (OECD, ২০১২বি) প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ও এই সমস্ত দক্ষতাকে সক্রিয় করে তোলা এবং সর্বোপরি তাকে প্রয়োজনীয় কোনও ক্ষেত্রে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর জন্য তিনটি মূল বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে।

দক্ষতার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামো

এই নিবন্ধের গোড়াতেই বলা হয়েছে যে, দুই রকম পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব। প্রথমত, চলতি যে ব্যবস্থাপনা অর্থনীতিকে ধরে রাখে তার দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্বনিযুক্তি ও নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগে সহায়তাকারী নতুন এক ব্যবস্থাপনা গড়েও এই লক্ষ্যপূরণের পথে এগোনো যায়। এই দ্বিতীয় পদ্ধতির সম্ভাবনা অপরিসীম কারণ এই ব্যবস্থায় উৎপাদনশীল দক্ষতা সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয় তথা আখেরে অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার ইন্ধন বরাবর জুগিয়ে যাবে।

এই নিবন্ধের লেখকরা দক্ষতার বিকাশের মাধ্যমে সুযোগের সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি কাঠামোর প্রস্তাব পেশ করতে চান।

প্রথম পন্থা

প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে কর্মীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ঘটিয়ে বিকাশ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার পথ। এখানে চালু শিল্পগুলির (শিল্প সংস্থা) কাজের জন্য যে দক্ষতা প্রয়োজন সেই দক্ষতা অর্জনের ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই শিল্পগুলিতে সুযোগ সীমিত কারণ একটা নির্দিষ্ট মাত্রার পর (স্যাচুরেশন) এখানে নতুন করে লোকবলের প্রয়োজন পড়বে না। তবে, বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের উপযুক্ত দক্ষতার অভাব থাকায় এখনও এই শিল্পক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা না থাকায় এই ক্ষেত্রে একটা বিরাট ঘাটতি তৈরি হয়েছে। সনাতন ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রথাগত শিল্পগুলিতে যথাযথ দক্ষতার অভাবের কারণে কর্মনিযুক্তির উপযোগী দক্ষতা ও বিভিন্ন চালু সুযোগ কাজে লাগানোর মধ্যে একটা ফারাক আমাদের চোখে পড়ছে।

চিত্র-১
'স্কিল ইন্ডিয়া' উদ্যোগের কাঠামো
(সূত্র : লেখকগণ—যোশী, দীক্ষিত ও ভাদৌরিয়া)

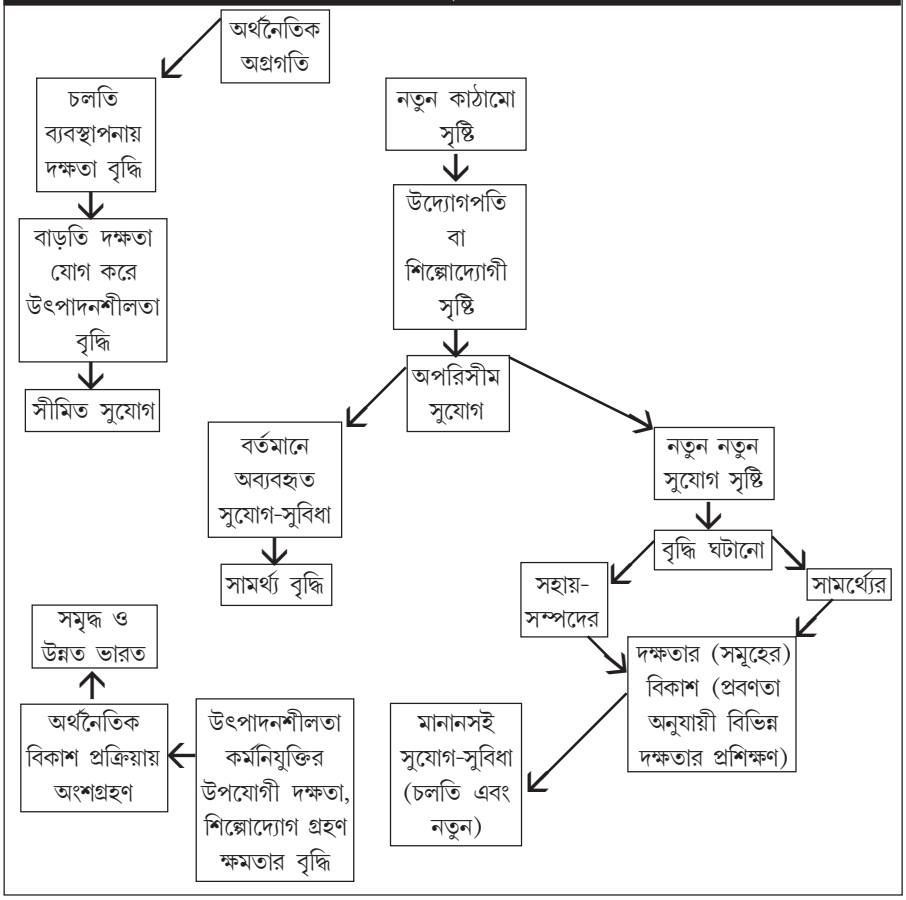

দ্বিতীয় পন্থা

এটা মূলত নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের পথ। শিল্পোদ্যোগ গ্রহণের এই প্রস্তাবিত কাঠামো বর্তমানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি কুড়ি বছর পরের নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এখানে শিল্পোদ্যোগমূলক এক সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার প্রচ্ছন্ন বাসনা কাজ করেছে সেখানে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা হবে সীমাহীন। এই পথে পৌঁছানোর আবার দুরকমের পদ্ধতি রয়েছে।

দ্বিতীয় পন্থা—প্রথম পদ্ধতি

যুব সম্প্রদায়কে আরও বেশি করে কর্মনিযুক্তির উপযোগী করে তোলা এবং তাদের অতিরিক্ত দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে এতদিন পর্যন্ত যে সমস্ত সুযোগ-

সুবিধা কাজে লাগানো যায়নি সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার। অর্থাৎ এই পদ্ধতির মূল কথাই হল সামর্থ্য বুদ্ধি।

দ্বিতীয় পন্থা—দ্বিতীয় পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ উদ্যোগপতিদের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো এই নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের ধারা বজায় রাখতে সর্বদাই উন্নত ও বর্ধিত সামর্থ্যের সন্ধানে থাকবে। এর ফলে সহায়সম্পদ ও সামর্থ্য উভয়েরই বৃদ্ধি ঘটাতে হবে। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণের যাতে কর্মরত ব্যক্তিরা নতুন যে সুযোগগুলি হাতের সামনে আসছে তার সদ্ব্যবহার ঘটানোর পাশাপাশি আগামী দিনের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলার জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখতে পারেন।

এই দুটি পথে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা বর্তমানে রয়েছে বা নতুন যে সব সুযোগ-সুবিধা আসবে তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় দক্ষতার যেন মেলবন্ধন ঘটে। তাহলেই তা কর্মনিযুক্তির পক্ষে সহায়ক হবে। এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটলে উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়বে, তেমনই তরুণ-তরুণীরা আরও বেশি করে কর্মনিযুক্তির যোগ্য হয়ে উঠবে। শিল্পোদ্যোগের প্রসার ঘটবে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকলে সমৃদ্ধ ও উন্নত ভারতের স্বপ্নটা অচিরেই বাস্তবায়িত হবে।❑

[লেখকবৃন্দ অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।
email : manoj.m.joshi@gmail.com
drarunbhadauria@gmail.com
shailjadixit1@gmail.com]

উল্লেখপঞ্জি :

Abidi, S., Joshi, M. (2015), *THE VUCA COMPANY*, Jaico Publishing House, Mumbai, India.

Diamond, P. (2011, June). Unemployment, vacancies, wages, American Economic Review, American Economic Association, Vol. 101, No. 4, pp. 1045-1072.

Mc Kinseys, (2014), Report on India's technology opportunity : Transforming work, empowering people.

Planning Commission Sub-Committee on Re-Modeling India's Apprenticeship Regime (2009, February). Report and recommendations, New Delhi. Sabharwal, M. (2013), Education, Employability, Employment and Entrepreneurship : Meeting the Challenge of the 4Es R. Maclean et al. (eds.), Skills Development for Inclusive and Sustainable Growth in Developing Asia-Pacific, Technical and Vocational Education and Training : Issues, Concerns and Prospects 19, DOI 10.1007/978-94-007-5937-4_4, Asian Development Bank.

Website of Planning Commission,
http://planningcommission.nic.in/hackathon/Skill%20Development.pdf retrieved on 09/09/2015

Website of world economic forum,
http://www.weforum.org/reports/global-talent-risks-report-2011 retrieved on 09/09/2015

প্র | চ্ছ | দ | নি | ব | ন্ধ

কর্মমুখী দক্ষতার বিকাশ ভারতের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক

ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্র বিরাট। জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়া প্রয়োজন শুধু এই ক্ষেত্রের জন্যই নয়, দেশের প্রতিরক্ষা, পরিকাঠামো, স্বাস্থ্যসুরক্ষা প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের দেশজকরণের মাধ্যমে আমদানির বিকল্প গড়ে তুলতেও। কর্মমুখী দক্ষতা বাড়াতে পারলে ভারতেই একদিন পৃথিবীর দক্ষতার মূল কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে বলেও মনে করেন লেখক আর সেই সম্ভাবনাই বর্তমান নিবন্ধে খতিয়ে দেখছেন **এস এস মান্থা।**

ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্র প্রায় ৯০ শতাংশের মতো বড়। যদিও কিছু বিশেষজ্ঞ এটাকে আরও বড় বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আর এটা ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে আশীর্বাদ ও অভিশাপ দুই-ই। আশীর্বাদ, কেননা এটা জনসংখ্যার এমন একটা শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে যেখানে যাদের আছে আর যাদের নেই তাদের মধ্যে বৈষম্য বিরাট। আর তাই এটা এক উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজের গ্রাহকদের চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করে। অন্যদিকে, এটা অভিশাপ এ কারণে যে এটা প্রথা বহির্ভূত অর্থনীতিকে এমনভাবে আঘাত করে যে তার ক্ষতিটা হয় সবচেয়ে বেশি।

সত্যিই কি এ দেশে প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও চাহিদা পূরণের মতো পর্যাপ্ত পরিমাণ কাজ আছে কিনা সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আরাম কেদারায় শুয়ে আমরা যে বিনা দ্বিধায় বলে দিই, যে মোট উৎপাদনের ৮০ শতাংশই নতুন করে কাজে লাগার মতো নয়। যেখানে বেশিরভাগ কর্মসংস্থানই হল কোনও রকমের কপাল ঠুকে লেগে যাওয়ার মতো আর তাই আমাদের ওই ধরনের প্রবৃত্তিটা আসলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির পুরোধাদের প্রিয় বিনোদন।

ওপরে যা বলা হল তা শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রশাসকদের শিক্ষার উপাদানগত সরবরাহ শৃঙ্খলটি সম্পর্কে রীতিমতো গুরুতর চিন্তার বিষয় কেননা শিক্ষার দৈন্যের জন্যই এই ব্যবস্থায় নানা ধরনের অসামঞ্জস্যের জন্ম হয়। বিদ্যালয় শিক্ষা এবং উচ্চশিক্ষার কি বর্তমান সমৃদ্ধির পথটি অনুসরণ করা উচিত, যেখানে সম্মুখ পথ ক্রমশ সংকীর্ণ এবং অসরল। নাকি নতুন পথের অন্বেষণ করা ভালো, যেটা মানচিত্রের বাইরে গিয়েও প্রত্যাশা ও সুযোগের নতুন নতুন রাস্তা খুলে দেবে এই মহান গণতন্ত্রের ধারক ও বাহকদের জন্য। কথার চচ্চড়ি বন্ধ করে এখন শিক্ষার চালচিত্রটাকে আরও একবার খতিয়ে দেখে নেওয়া যেতে পারে। আর সেই সঙ্গেই কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানগত সক্ষমতার সঙ্গে তার যোগাযোগটাকে খতিয়ে দেখার দরকার হয়ে পড়েছে। যদিও এই দুটি বৈশিষ্ট্যকে আমরা সমস্যা অথবা সুযোগ যেভাবেই দেখতে চাই না কেন, ওদের মোকাবিলা করতে হবে একইভাবে। কেননা জনসংখ্যাগত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে মোট লোকসংখ্যার অর্ধাংশ বা তার বেশি এখন নবীন প্রজন্মের দিকে ঝুঁকে থাকবে আগামী দশ বছর বা তার বেশি। মনে রাখতে হবে যে ওই নবীন প্রজন্মের বুকের আগুনটা ধাবমান জাতির পক্ষে জ্বলন্ত হয়ে উঠে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে দিতে পারে। শিক্ষার অভাব এবং কর্মমুখী দক্ষতার অপ্রতুলতা হল এমন এক সংক্রামক অভ্যাস যেটা আমাদের বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই কাটিয়ে উঠতে হবে। আর যত তাড়াতাড়ি আমরা এটা করতে পারব ততই এটা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য ভালো হবে। শিক্ষা অবশ্যই স্বাধীনভাবে জীবন কাটানোর দরজাটা খুলে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কর্মমুখী দক্ষতা ওই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তোলে আলোটাকে ঘরে আনার সুযোগ করে দিয়ে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা অসদৃশ পর্যায়ে যেসব কাজের সুযোগ রয়েছে তার প্রকৃত চিত্রটা তৈরি করা প্রয়োজন আর তিন ধরনের কাজের বাজারের প্রতিটিতেই কর্মসংস্থানের উন্নতি ঘটানোর জন্য আমাদের সচেতনভাবে প্রয়াস নিতে হবে। এর ফলে অর্থনীতির উন্নতি ঘটবে, মোট দেশীয় উৎপাদন বাড়বে আর এগুলোর ছোঁয়া লাগবে কাজের সুযোগের ক্ষেত্রে। ভারত যেন বিশ্বের কর্মমুখী দক্ষতার রাজধানী হয়ে উঠে আমি সেটাই চাইব। আর সেজন্য শিক্ষার সঙ্গে কর্মমুখী দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের আত্তীকরণ ঘটিয়ে এমন এক সুদক্ষ কর্মীবল গড়ে তুলতে হবে, যারা গুণমান ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মাপকাঠি অনুযায়ী যোগ্য। এটা সম্ভব হলে ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তার থাকবে যার সাহায্যে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সমর্থন মিলবে আর নতুন কাজের বাজারের সুযোগও মিলবে। নানা জিনিসের নেপথ্যে

ইন্টারনেট কেন্দ্রিক নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভারতের ডিজিটাল রূপান্তর একটা বিরাট বিকাশ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবতন্ত্র হিসেবে কাজ করবে।

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (ভিইটি) হল দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়াসে একটা জরুরি উপাদান, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার অত্যন্ত জরুরি দরকার আছে, যাতে করে প্রশিক্ষণ হয় সহজে অদলবদল করার মতো নমনীয়, সমসাময়িক, প্রাসঙ্গিক, ও সকলকে শামিল করার মতো এবং সৃজনশীল।

ভারতের জনসংখ্যা ১২৬ কোটি ৭০ লক্ষের বেশি এবং এখানে ৪৭ কোটি ৪১ লক্ষের মতো শ্রমবল রয়েছে, যার মধ্যে ৩৩ কোটি ৬৯ লক্ষ হল গ্রামীণ শ্রমিক আর ১৩ কোটি ৭২ লক্ষের মতো শহুরে (এনএসএসও-এর ২০১১-১২ শেষতম সমীক্ষা অনুযায়ী)। ২০১০-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশে নথিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৪ কোটির বেশি। কর্মহীনতার হার যেখানে ৮.৮ শতাংশ আর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বছরে ১.৫ শতাংশ সেখানে সকলের জন্য অর্থবহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাটা নিঃসন্দেহে একটা দুঃসাধ্য কাজ। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতীয়দের প্রায় ৩৫ শতাংশের বয়স ১৫ বছরের কম আর প্রায় ৫০ শতাংশই হল ২৫ বছরের নীচে। ভারতে গড় আয়ু ২৪ বছর, যা একে বিশ্বের নবীনতম জনসংখ্যা বিশিষ্ট দেশগুলির মধ্যে রেখেছে।

কর্মহীনতার পরিসংখ্যানের সঙ্গে সঙ্গে ইতিমধ্যেই চাপের মধ্যে থাকা ব্যবস্থাকে আরও চাপে ফেলছে ড্রপ আউট বা ছেড়ে দেওয়ার হার। ২০১৩ সালের বার্ষিক শিক্ষাগত অবস্থার প্রতিবেদন শিক্ষাগত যোগ্যতার (এএসইআর) অনুসারে ২২ কোটি ৯০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী গ্রাম ও শহর মিলিয়ে বিভিন্ন স্কুলে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণিতে রয়েছে। হিসেবে দেখা গেছে দেশের ৪৩ কোটি ছেলেমেয়ের বয়স ১৮ বছরের কম। লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়াটা ঘটে মূলত শিক্ষার জন্য খরচের অসামর্থ্য আর তদুপরি সাধারণভাবে উৎসাহের অভাবের জন্য। এই সব ছেলেমেয়ে নানাভাবে কাজ করে এবং যে কোনও ভাবেই হোক না কেন, বাবা-মাকে সাহায্য করে কিছু না কিছু উপায় করে।

মাধ্যমিক স্তরে স্কুলে ভর্তির হার (মোট শতাংশের হিসেবে) ২০১০ সালে ছিল ৬৩.২১ শতাংশ আর শেষ পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে সেটা ছিল ২০ শতাংশ। আরও পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ২০১৩-১৪-তে দশম মানের বোর্ডের পরীক্ষায় ১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ছেলেমেয়ে বসে থাকলেও উত্তীর্ণ হয় ১ কোটি ২৮ লক্ষ ৩৩ হাজার। ৩৬ লক্ষ ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী (৩৪ শতাংশ) অকৃতকার্য হয় আর সম্ভবত প্রত্যেক বছরই পড়া ছেড়ে দেয়। ২০১৩-১৪-তে দ্বাদশ মানের বোর্ডের পরীক্ষায় ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৩ হাজার ৪-শোর মতো থাকলেও ৯৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রী কৃতকার্য হয়। ২৪ লক্ষ ২৩ হাজার ছেলেমেয়ে (২২ শতাংশ) পাশ করতে পারেনি। আর এরাই প্রতি বছর লেখাপড়া ছেড়ে দেয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে দেশের শ্রমবলের ৬০ শতাংশই হল স্বনিযুক্ত। যাদের অধিকাংশই থেকে যায় নিতান্ত গরিব হয়েই। প্রায় ৩০ শতাংশ হল ঠিকা শ্রমিক। মাত্র ১০ শতাংশ হল নিয়মিত কর্মী, যাদের দুই পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নিযুক্ত। আবার মোট শ্রমবলের ৯০ শতাংশের বেশিই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে। অর্থাৎ এমন সব ক্ষেত্রে যেখানে কোনও সামাজিক সুরক্ষা নেই এবং কাজের অন্যান্য লাভজনক সুবিধা যেগুলি কিনা সংগঠিত ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

ভারতের মাথাপিছু আয় এবং উৎপাদনশীলতা অত্যন্ত কমের দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। জাপানে মাথাপিছু আয় ৩০ হাজার ডলার। যেটা শ্রীলঙ্কায় ৮৭৯ ডলার। আর ভারতে সেটা মাত্র ৪৩৩ ডলার। বর্তমানে ভারতের মাথাপিছু আয় উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু আয়ের মাত্র ৭.৫ শতাংশ। বিশেষজ্ঞদের মতে এই অঙ্কটা আগামী ৫০ বছরে ৮০ শতাংশে বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার দরকার।

দক্ষতার ফাঁক ও তার গূঢ়ার্থ

'অ্যাস্পায়ারিং মাইন্ডস'-এর পক্ষ থেকে দেশজুড়ে স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রদের নিয়ে যে সমীক্ষা চালানো হয়েছে, তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতে বছরে ৫০ লক্ষ স্নাতক তৈরি হয়। তবে আমরা কিন্তু বিপণনযোগ্য কর্মমুখী দক্ষতা এখনও যথাযোগ্য জায়গায় আনতে পারিনি। স্নাতক ছাত্রদের এই আধিক্য হোয়াইট-কলার চাকরির চাহিদাটা মারাত্মকভাবে বাড়িয়ে তোলে। যেটা যত সত্বর দরকার তা আদৌ মিলে না। এই যে জোগানোর জায়গার উলটো পরিস্থিতি তার ছলেই আন্ডার-এমপ্লয়মেন্ট বা অপর্যাপ্তমানের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। যেহেতু সম্ভাবনাময় শ্রমবলের সঙ্গে একই হারে কাজ বাড়ছে না। আর তার ফলে কর্মহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে। আর তার থেকেই জন্মাচ্ছে অসন্তোষ। এই সব বিষয়গুলি ধীরে ধীরে বড় হতে হতে বিরাট আকারের অসন্তোষ জন্মানোর আগেই খুব তাড়াতাড়ি এগুলির প্রতিকার করা দরকার।

পথের বাধা

উপযুক্ত গুণমানের বৃত্তিমূলক দক্ষতার অদক্ষতা, যেটা উৎপাদনশীলতা বাড়ায়, তার অভাব, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বাবা-মা ও ছাত্রদের কর্মমুখী দক্ষতা বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ডিগ্রি সংক্রান্ত যোগ্যতা বাড়িয়ে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গি এই সবই হল গুরুতর প্রতিবন্ধকতার মতো। পরিষেবা ক্ষেত্রকে খুব বেশি মাত্রায় প্রশ্রয় দেওয়া আর প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মসংস্থান ক্ষেত্রগুলিকে একটা ধারাবাহিক ও স্থিতিশীল বিকাশ বজায় রাখার অক্ষমতা সমস্যাটাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

সুযোগ

যারা এখন কলেজে রয়েছে, তাদের ভালো কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই সব ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাটা খুবই কম—১০০-তে ২০ জন, সেসব ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় কম যারা কলেজ পর্যায়েই মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেয় অথচ কাজ পেতে যাদেরও এই ধরনের কর্মমুখী দক্ষতা দরকার। বহু প্রতীক্ষিত কর্মমুখী দক্ষতা ক্ষেত্রের বিকাশটা আসলে নানা সুযোগ এনে দেয়। বেশিরভাগ উন্নতিশীল অর্থনীতি উন্নতির হার বেশ ভালোই। তাই আমাদের সামনে রয়েছে বিরাট সুযোগ। সাম্প্রতিক একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুসারে বয়স বাড়তে থাকা মানুষের সংখ্যা আগামী কয়েক বছরে জাপানে দাঁড়াবে ৮০ লক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১ কোটি ৭০ লক্ষে আর গোটা ইউরোপে জনসংখ্যার ৪ শতাংশে। ভারতের কি এই সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত নয়। আমরা দেখতেই পাচ্ছি আমরা যদি এই সুযোগটা কাজে না লাগাই সেটা চীন, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে চলে যাবে।

কী করতে হবে?

স্কুল ও কলেজ উভয় পর্যায়ের শিক্ষায় কর্মমুখী দক্ষতাকে শিক্ষার মূল স্রোতে নিয়ে আসার একটা বিরাট উপায়। প্রথাবিহিত শিক্ষা থেকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় একাধিক পর্যায়ে যাওয়া আসার সুযোগ বাড়ানো এবং একইভাবে কাজের বাজারে যাতায়াতের সুযোগ পাওয়াটা আর সেই সঙ্গে কেবল কর্মমুখী দক্ষতার শংসাপত্র পাওয়ার বিকল্প খোলা রাখা এবং আগে শিখে আসা জ্ঞানের স্বীকৃতি দেওয়াটা এক্ষেত্রে আরও বিকল্প বাড়াতে পারে।

বৃহত্তর লক্ষ্য হচ্ছে নতুন নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি আর বাজার বাড়ানো যাতে করে কর্মহীনতার মোকাবিলা করা যায় আর সেই সঙ্গে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' লক্ষ্যটিরও বাস্তবায়ন ঘটানো যায়।

সামনের দিকে এগিয়ে চলা

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ) গড়ে তোলা যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মমুখী দক্ষতা বাড়ানোর সব প্রয়াসগুলির সম্মেলন ঘটানো চলে রাজ্যের এই সব পৃথক পৃথক প্রয়াসের সঙ্গে, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এটা অবশ্যই বিনিয়োগে সর্বোত্তম লাভ পাওয়ার এক অভিন্ন আদর্শ নিয়ে কাজ করবে। আর একটা এমনই প্রয়াস হল 'মেক ইন ইন্ডিয়া' হাব গড়ে তোলা যেটা প্রতিরক্ষা, রেল, পরিকাঠামো ও কৃষির মতো নানা ক্ষেত্রে ব্যাপক হারে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেবে। এর ফলে প্রচুর সংখ্যক নতুন কাজ তৈরি হবে এবং সেই চাহিদা পূরণে নতুন নতুন কর্মমুখী দক্ষতার প্রয়োজনীয়তাও দেখা দেবে।

দক্ষতার জন্য আদর্শ মান ও নীতি

অর্থনৈতিক বিকাশের সাধারণ মান, সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ, যে মাত্রা পর্যন্ত রফতানি উচ্চ মূল্যযুক্ত পণ্য কেন্দ্রিক, যে পর্যায় পর্যন্ত কর্মমুখী দক্ষতা আর কাজের সামঞ্জস্য থাকে না সেই পর্যন্ত এবং উৎপাদনশীলতার বিকাশের হারের ওপর এই কর্মমুখী দক্ষতার সাফল্য নির্ভর করে। কর্মমুখী দক্ষতার সামঞ্জস্যহীনতার হিসেবটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে আদর্শ মান স্থির করাটা অত্যাবশ্যক।

জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কর্মমুখী দক্ষতার প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা ও গুণমান ফাউন্ডেশনের আদর্শ মান ও নীতি অনুযায়ী কর্মমুখী দক্ষতার প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার জন্য নীতি শিক্ষার আদর্শ স্থির করতে হবে। দেশের নানা জায়গার ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করতে হবে। তাদের জন্য কর্মমুখী দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শংসাপত্র, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রি দিতে হবে শংসায়নের নানা পর্যায়ে, উপকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে, কর্মমুখী দক্ষতার প্রকল্প পরিচালনার জন্য বর্তমান কোনও কলেজ/আইটিআই/পলিটেকনিককে অনুমোদন দিতে হবে, সব ভাষায় এবং শিক্ষা প্রদানের সব মডেলে কর্মমুখী দক্ষতার বিষয়গত এবং অধ্যাপনাগত সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হবে, উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য সেল তৈরি করতে হবে। কর্পোরেট স্তরের সামাজিক দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত প্রয়াসের জন্য সুযোগ তৈরি করতে হবে, কর্মমুখী দক্ষতার ফাঁকটা যাচাই করতে হবে, এই সংক্রান্ত গবেষণা করতে হবে। স্থানীয় ও বিদেশি স্তরের সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বলিষ্ঠ ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের স্বীকৃতি প্রদানের প্রক্রিয়া গড়ে তোলার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের জন্য মাঝারি, ক্ষুদ্র ও অণু শিল্পের সঙ্গে সংহতি গড়ে তুলতে হবে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রচারাভিযান চালানোর সঙ্গে সঙ্গে আগামী দশ বছরের জন্য কর্মমুখী দক্ষতার বিকাশের মানচিত্র রচনা করতে হবে, জনগোষ্ঠীভিত্তিক কলেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করতে হবে। কাজের সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষণ মডেল গড়ে তোলার জন্য উৎসাহ জোগানোর পাশাপাশি দক্ষতা সংশ্লিষ্ট মেধাবৃত্তি চালু করতে এবং এই পর্যন্ত বলা সমস্ত কিছুকে একটি সুসম্পূর্ণ ই-গভর্নেন্স কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে পেমেন্ট গেটওয়ে বা অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা-সহ একটি বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সবরকম প্রয়াস নিতে হবে। আর এই সাফল্যের জন্য অটোমোবাইল, আইটি, যোগাযোগ, প্যারামেডিক্যাল, প্রস্তুতিকরণ, নির্মাণ, রিটেল বা খুচরো বিপণন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পর্যটন প্রভৃতি বহু ধরনের ক্ষেত্রকে লালন-পালনও করতে হবে। এগুলি অবশ্য স্বল্পমেয়াদি হতে পারে কিন্তু কেন্দ্রীভূত মডিউলার স্বীকৃতিভিত্তিক বিভিন্ন ভাষার এবং সহজে পরিবর্তনযোগ্য হওয়া চাই।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ এবং কর্মমুখী দক্ষতা

গবেষণা ও বিকাশের জন্য আমাদের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রচুর তহবিল জোগানোর ব্যবস্থা রয়েছে। যদিও এই ব্যবস্থা ওই সব জ্ঞানমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিবর্ধনমূলক সহায়তা জুগিয়ে থাকে। কিন্তু এগুলি কি আদৌ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং এই অবস্থাটা কি ফিরে দেখার প্রয়োজন নেই?

প্রতি বছর হাজার হাজার পিএইচডি-র প্রয়োজন হয়। কিন্তু যেসব গবেষণা শিল্পের ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি সাহায্য করতে পারে, তেমন বাধ্যতামূলক গবেষণা কোথাও সিএসআইআর/ডিআরডিও-এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত গবেষণাগারগুলির জন্য এবং আইআইটি-গুলির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বাধ্যতা হওয়া উচিত এমন ধরনের উদ্ভাবন যা কাজের বা কর্মসংস্থানের সহায়তা করে। এই সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটিতে নানা ধরনের আইপিআর-পেটেন্ট-শিল্পোদ্যোগী সেল গড়ে তোলা প্রয়োজন। এটা একদিকে যেমন গবেষণাযোগ্য সম্পদের সঙ্গে যুক্ত হবে ঠিক তেমনিভাবে জাতীয় স্তরের আলোচ্যসূচির সঙ্গে সংযুক্তি লাভ করবে। তেল অনুসন্ধান, খনন বিদ্যা, কৃষিকার্য, বিদ্যুৎ, জলসম্পদ এবং পরিকাঠামোর মতো প্রধান প্রধান প্রযুক্তি ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে উচ্চ অগ্রাধিকার থাকা উচিত এবং এসব ক্ষেত্রেই সব থেকে সেরা অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এর ঠিক পরের পর্যায়ের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত পরিবেশ, জলবায়ুগত পরিবর্তন ও শক্তি, জীববিজ্ঞান, জৈব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং জেনেটিকস-এর ক্ষেত্রে উদ্ভাবনের মাধ্যমে সুরক্ষা জোগানোর ক্ষেত্রে। যেসব ক্ষেত্রগুলির কথা বলা হল সেগুলির প্রতিটিতে উদ্ভাবনীমূলক কাজকর্ম যেন নানা ধরনের ডাউনস্ট্রিম বা অনুবর্তী কাজকর্মের সঞ্চার করতে পারে। নতুন সরকারের একশোটি মডেল নগর গড়ে তোলার ঘোষণাটা পরিকাঠামো ক্ষেত্রের বিকাশ এবং নতুন কাজের বাজারের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে একটা মাস্টার স্ট্রোক। এটাই কর্মমুখী দক্ষতার বাজারে গতি সঞ্চার করবে।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সরঞ্জামের প্রস্তুতি এবং কম্ব্যাট রিকোভারি ভেহিক্যাল (সিআরভি) মানুষবিহীন বায়ুযান (ইউএভি), স্নোমোবাইল বা তুষার যান, বুলেটরোধী জ্যাকেট, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা প্রভৃতি এ দেশেই তৈরি এবং আমদানি বন্ধ করার জন্য ইএমই স্কুল, ডিআরডিও গবেষণাগার এবং প্রধান প্রধান নানা প্রতিষ্ঠান ও কিছু বিশেষ শিল্পের সঙ্গে সহযোগিতা করাটা এক্ষেত্রে একধাপ এগিয়ে রাখার লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সিআরভি-র মতো একটি ব্যবস্থাকে যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য উপব্যবস্থায় ভেঙে ফেলা যায়। জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রাজ্যে থাকা উপকেন্দ্রগুলি এবং বেছে নেওয়া কোনও শিল্প এই উপব্যবস্থাগুলিকে আমাদের মাপকাঠি অনুযায়ী নতুন করে তৈরি করতে পারে। জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সব উপব্যবস্থাগুলিকে একত্রিত করার ভূমিকায় থাকবে। ওই বিকল্প/দেশজ প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যেটা আমাদের দরকার আবার এই এনএসইউ বা জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রযুক্তিগত বিকাশের পূর্বাভাস দেওয়া, উদ্ভাবনী প্রয়াস ও দেশীয়করণ, এর লালন পালন করা এবং সুরক্ষিত এলাকার গবেষণায় বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য সমীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে এবং এক্ষেত্রে তারা পৃথিবীর সেরা সংস্থা যেমন সিএসইউ এবং এমআইটি স্ট্যান্টফোর্ড, ইমপিরিয়্যাল কলেজ, হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়, হেল্‌মহোলৎজ অ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতির সঙ্গে সহযোগিতারও ব্যবস্থা অনায়াসে করতে পারে। ‘ফ্রনহোফার-গিজেলশ্যাফট’-এর মতো গবেষণাকেন্দ্র এনএসইউ-র চারপাশে ভারতের কয়েকটা বিশেষ শহরে গড়ে তোলার জন্য একটা গুরুতর প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। এটা শুধু যে স্বনির্ভরশীলতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কেন্দ্রীভূত গবেষণার জন্য বিরাট সহায়তা জোগাবে তাই নয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে উপাদান জুগিয়ে প্রক্রিয়াগত উন্নতি এবং প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন স্তরের কাজের বাজারেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারবে।

এই গোটা প্রক্রিয়াটায় নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টির প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে আর নতুন দক্ষতামূলক প্রয়াস গড়ে তোলারও সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডারের খরচ প্রচুর বাঁচানোর কথা তো ছেড়ে দেওয়াই গেল। সেই সঙ্গে স্থানীয় সক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে নতুন প্রত্যয়ের সঞ্চার করবে কেননা তখন আমরা বিশ্বের সর্বজনীন ঐক্য ও কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করতে পারব এবং সারা পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রত্যয়ী, নতুন করে জেগে ওঠা এক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের তুলে ধরতে পারব।

কল্যাণমূলক কোনও সমাজে যেখানে নজরটাই থাকে অনুন্নতদের জন্য সামাজিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা করা এবং সেক্ষেত্রে ভারতে দেশজদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের সুরক্ষা সকলেরই কল্যাণ সাধন করবে এমনটাই আশা করা যায়। এটা প্রকৃত অর্থে তখনই সম্ভব হবে যখন দেশের প্রতিটি শিশু শিক্ষা লাভ করবে এবং পরবর্তীকালে কাজের সুযোগ পাবে। জাতীয় কর্মমুখী দক্ষতা মিশন এটাকেই সম্ভব করে তুলবে প্রকৃত অর্থে।

আমাদের এটাও উপলব্ধি করতে হবে যে বয়ঃসন্ধিকালীন শিশুরা এ দেশে এমন ধরনের আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে আসে যাতে তাদের কাজের উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য নিতান্ত সামান্য সংস্থানই থাকে, তাই এই সব তরুণদের শিক্ষাগত চাহিদা মেটানোর জন্য বিশ্বাসযোগ্য আর্থিক মডেল খুবই দরকার। এক্ষেত্রে আমি আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতাদের জন্য একটা মডেল গ্রহণের পরামর্শ দেব। কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের যে ১১,৫০০-র বেশি প্রতিষ্ঠান রয়েছে,

তাদের মধ্যে আমরা যদি জনগোষ্ঠীগত কলেজভিত্তিক কাঠামোর জন্য পাঁচ হাজারকেও বেছে নিই, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলি চালানোর উদ্দেশ্যে তাহলে এই সুযোগটা প্রকৃত অর্থেই অত্যন্ত বিরাট হয়ে দাঁড়াবে।

স্কুলগুলিতে একটা নতুন বিভাগ যদি যুক্ত করা হয় যেটা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের দিকে জোর দেবে তবে তা হবে প্রথাগত সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিরাট সংযুক্তি এবং সরবরাহ শৃঙ্খলটাকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়ে যেতে এটা একটা পরিপূরক পথ হিসেবে কাজ করবে। এই ব্যবস্থাটাকে প্রসারিত করে দেখলে যদি ১০০ ছাত্রছাত্রীকে যোগ্যতাভিত্তিক কর্মমুখী দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়া যায়, এক এক ব্যাচে ৫০ জন হিসেবে সপ্তাহে ৩ দিন, দিনে ৩ ঘণ্টা করে, বছরে ৪৮ সপ্তাহ ধরে, তাহলে প্রত্যেক বছর অন্তত ৫ লক্ষ ছাত্রছাত্রীকে এভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে। আর এই সব ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেককেই গরিব ধরে নিয়ে এই কর্মসূচি চলাকালীন দিনে ৫০ টাকা করে খাওয়া-দাওয়া এবং যাতায়াতের জন্য দেওয়া হয়। তাহলে সেই বাবদ বছরে ৭২০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে। আর যেসব প্রতিষ্ঠান এই সব ছাত্রছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেবে, তাদের যদি ১৫০ কোটি টাকা বছরে দেওয়া হয়, তাহলে মোট প্রকল্প ব্যয়টা দাঁড়াবে বছরে ৮৭০ কোটি টাকা। এই অর্থের পরিমাণ উল্লেখিত কর্মসূচিতে যে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে তার বিবেচনায় নিতান্তই অল্প আর এক্ষেত্রে তো যে বিরাট রাজনৈতিক লাভ হবে সেকথা ধরাই হচ্ছে না।

আমাদের যুব শক্তিকে অনুপ্রাণিত এবং কর্মে নিযুক্ত করতে হবে এবং বিভাজনমূলক শক্তিগুলি থেকে তাদের সরিয়ে নিয়ে এসে এমন একটা পরাক্রমশালী শক্তিতে তাদের রূপান্তরিত করতে হবে, যেটা অর্থনীতিকে অনায়াসে এক উচ্চতর তলে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অবশ্যই তার জন্য 'উইন উইন' বা সকলের জন্য জয়মূলক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে আর এটা কিন্তু আদৌ কোনও সুদূরপ্রসারী ধারণা নয়। জনসংখ্যাগত লাভের দিকটাকে কাজে লাগানোর অপেক্ষায় থাকবেন না, বরঞ্চ এমন একটা পথ বা যান তৈরির চেষ্টা করুন যেটা দ্রুততর অধিকতর নিরাপদ ও নতুন প্রবণতা সৃষ্টি করে। সব কিছুর ওপরে বর্তমান ব্যবস্থাগুলিকে আরও জোরদার করা এবং সৃজনশীল উদ্ভাবনের কথা ভাবুন, নতুন কিছু সৃষ্টির লক্ষ্যে। দক্ষতা অর্জন এবং তার প্রশিক্ষণ অবশ্যই এমনই একটা প্রয়াস যেটা একটা মহান জাতিকে প্রকৃতই গতিশীল করে তুলতে পারে।❑

[লেখক AICTE-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান।
email : ssmantha@vjti.org.in]

WBCS এবং IAS—'Anthropology Optional'

প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষক উপল মান্না।

Upal Manna, M.Sc. Gold Medalist in Anthropology.
Specialist teacher to teach 'Optional Anthropology'
for 'Civil Services'.

প্রাক্তন শিক্ষক, **Haldia Govt. College**
প্রাক্তন শিক্ষক, **Maharishi Institute (MCDP)**

Anthropology বিষয়টি পড়া, বোঝা ও মনে রাখা অনেক সহজ এবং যথেষ্ট নম্বর পেতে সাহায্য করে। কারণ এই বিষয়টিতে রয়েছে উপজাতিদের জীবন কাহিনি, মানবসমাজ ও সংস্কৃতি এবং মানুষের বিবর্তন ও জৈবিক বৈচিত্রের কথা॥

IAS এবং WBCS দিতে ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীরা পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের জন্য কথা বলুন॥

—ঃঃ যোগাযোগ ঃঃ—

9231921650 ● 9007917562 ● 8337062060

আমাদের ঐতিহ্যবাহী হস্তচালিত তাঁতের সংরক্ষণ ও প্রসার

হস্তচালিত তাঁত আমাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কীভাবে এই শিল্পকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে এর পুনরুজ্জীবন ঘটানো যায়, **মণিকা এস গর্গ***-এর লেখায় রয়েছে তার দিশা। হাতে বোনা তাঁতে শিল্পের সার্বিক সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য উপায় তুলে ধরা হয়েছে এই নিবন্ধের পরিসরে।*

হস্তচালিত তাঁত কীভাবে পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, তা কেবল তত্ত্বগত আলোচনার বিষয় নয়। এ জন্য এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বুঝে সেই অনুযায়ী নীতি প্রণয়ন করতে হবে। প্রকল্পগুলি এমন হতে হবে, যাতে সেগুলি এই ক্ষেত্রের বহুমাত্রিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক হয়। সুপ্রাচীন এই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, আয় বৃদ্ধি, আরও বেশি মানুষকে এই পেশার প্রতি আকৃষ্ট করা, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সার্বিকভাবে তাঁত সম্পর্কে সামাজিক মনোভাব পালটানোর ওপর জোর দিতে হবে।

উপযুক্ত পণ্য হিসাবে হস্তচালিত তাঁত

জরি ছাড়া যেমন বিয়ের পোশাক ভাবা যায় না, তেমনি আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও হস্তচালিত তাঁত ছাড়া অসম্পূর্ণ। ঋগ্‌বেদ, মহাভারত ও রামায়ণে বয়নশিল্পের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। হাতে বোনা পোশাক, হাড়ের তৈরি ছুঁচ পাওয়া গেছে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পায়। গুজরাটি ধাঁচে ব্লক প্রিন্টেড কাপড় মিলেছে মিশরীয় সমাধিস্থলে। এ থেকে বোঝা যায় বিদেশে বরাবরই ভারতীয় কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ঊনবিংশ শতক থেকেই চালু হয়েছিল ভারতীয় কাপড়ের রপ্তানি।

উৎকর্ষের এই ঐতিহ্যকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালন করে গেছেন আমাদের হস্তচালিত তাঁতের দক্ষ শিল্পীরা। বর্তমানে এই শিল্পে নিযুক্ত ৪০ লক্ষেরও বেশি তাঁতি ও সহযোগী উৎপাদন শ্রমিক। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই তপশিলি জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর সম্প্রদায়ভুক্ত এবং মহিলা। কৃষির পর এই শিল্পের উপরেই সব থেকে বেশি মানুষের জীবিকা নির্ভর করে। এই শিল্প পরিবেশ বান্ধব, বিকেন্দ্রায়িত, গ্রামভিত্তিক এবং আমাদের উন্নয়নশীল অর্থনীতির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তবে ২০১০ সালের হস্তচালিত তাঁত সংক্রান্ত বিষয়ে শুমারি অনুযায়ী এক্ষেত্রে শোচনীয় প্রবণতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। তাঁতিদের সংখ্যা কমছে বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে। পরবর্তী প্রজন্ম এই শিল্পের প্রতি উৎসাহী নয়। সব মিলিয়ে হস্তচালিত তাঁতশিল্প এগিয়ে চলেছে সূর্যাস্তের দিকে।

এই অবক্ষয়ের কারণ বহুমুখী। গণনায় দেখা যাচ্ছে, দেশে একজন শ্রমিকের গড় মাসিক আয় যেখানে ৪৫০০ টাকা, সেখানে একজন তাঁতশিল্পী মাস গেলে মেরেকেটে হাতে পান মাত্র ৩৪০০ টাকা। শিল্পীরা স্বাচ্ছন্দ্যে না থাকলে কোনও শিল্পই বাঁচতে পারে না। তাঁতশিল্পীরা সমাজে আরও সম্মানের অধিকারী। চিত্রশিল্পী ও অন্যান্য শিল্পীর মতোই তাঁদের সমাদর পাওয়া উচিত। হাতে বোনা তাঁদের শিল্পের কোনও তুলনা হয় না। সুতোর বুননে জড়ানো থাকে তাঁদের আবেগ, ধৈর্য, আভিজাত্য ও দক্ষতা। এর উপযুক্ত সাম্মানিক তাঁদের প্রাপ্য।

প্রথাসিদ্ধ তাঁতবস্ত্রের সংখ্যা ও বৈচিত্রের দিক থেকে বিশ্বে ভারতের স্থান ঈর্ষণীয়। পৃথিবীতে হস্তচালিত তাঁতসামগ্রীর ৮৫ শতাংশই উৎপাদিত হয় ভারতে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো তাঁত উৎপাদক দেশগুলির পণ্যসম্ভার খুবই সীমিত। মূলত দেশের অভ্যন্তরে ব্যবহারের জন্যই এগুলির উৎপাদন হয়। অন্যদিকে ভারতের তাঁতবস্ত্রের রপ্তানির পরিমাণ ২০০৯-১০ সালে ছিল ২৬ কোটি ডলার। ২০১৩-১৪ সালে এই পরিমাণ বেড়ে হয় ৩৭ কোটি ডলার। বিকাশহার ৪০ শতাংশেরও বেশি।

এই বিকাশহার থেকেই তাঁতশিল্প ক্ষেত্রের অমিত সম্ভাবনা বোঝা যায়। জনগোষ্ঠীগত সুবিধা ও বহুমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সুবাদে সারা বিশ্বের তাঁতবস্ত্রের চাহিদা মেটাবার ক্ষমতা ভারতের রয়েছে। এ জন্য নতুন যুগের বহুমুখী, দ্রুত পরিবর্তনশীল, জটিল চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। তাঁতশিল্পে আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে মেশাতে হবে আধুনিক ডিজাইন।

বেনারসি বা চান্দেরি শাড়ি বুনছেন যে শিল্পী, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সমসাময়িক করে তুলতে পারলে আরও বেশি দাম পাবেন। তাঁর উপার্জন আরও বাড়বে, যদি তিনি চাদর, স্কার্ফ, টাই, বেল্ট, ব্যাগ, পাউচ, হাতব্যাগ

এবং বিছানার চাদর, টেবিলের ঢাকা, পর্দার মতো ঘর সাজানোর জিনিস তৈরি করে তা রপ্তানির উদ্যোগ নেন। পণ্যসামগ্রীর এই বহুমুখীকরণ ও উন্নয়নের জন্য তাঁতশিল্পীদের সঙ্গে ডিজাইনারদের সহযোগিতা ও সমন্বয় একান্ত আবশ্যক। এ জন্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ফ্যাশন টেকনোলজিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। NIFT-র ছাত্রছাত্রীরা তাঁতশিল্পীদের কাজের জায়গায় যাচ্ছেন। এতে একদিকে যেমন তাঁরা তাঁদের অমূল্য ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন, তেমনি তাঁতশিল্পীরাও ওয়াকিবহাল হচ্ছেন আধুনিক ডিজাইনের বিষয়ে। ঝাবুয়ার পুঁতির পুতুল বিক্রি করে যা আয় হয়, তার থেকে ২০ গুণ বেশি রোজগার হতে পারে এগুলিকে দুল বা গাড়ি সাজানোর উপকরণে রূপান্তরিত করলে। এই রোজগার ১০০ গুণ পর্যন্ত বাড়তে পারে, যদি এর সঙ্গে তাঁতের তৈরি বস্ত্রখণ্ড যোগ করে ন্যাপকিন হোল্ডারের মতো জিনিস বানানো যায়। এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ পরিশ্রমসাধ্য। সমীক্ষা, তার ফলাফল পর্যবেক্ষণ, যথাযথভাবে তা লিপিবদ্ধ করা এবং সেই মতো বাজারের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন—দীর্ঘমেয়াদি এমন নানা প্রচেষ্টাই এই শিল্পের উন্নয়ন ঘটাবে।

ডিজাইনাররা যেমন পণ্যে মূল্য সংযোজন করেন, তেমনি মূল্যশৃঙ্খলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব হল বিপণন। আজ বাজারের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট অংশের চাহিদা চিহ্নিত করে মেটাতে এই শিল্প ব্যর্থ হচ্ছে। বাজারের বিভাগগুলি বুঝে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পাটানপাটোলা, কানি, বালুচরী, জামদানির মতো প্রথম সারির পণ্যগুলি উপযুক্তভাবে তুলে ধরা উচিত। পুরাকথা, বিশ্বাস ও প্রতীকের সংমিশ্রণে এই সব পোশাকের বুননে তাঁতশিল্পীরা এক অনন্যতার সৃষ্টি করেন। অসাধারণ নকশা ও অনন্য বুননশৈলী সমন্বিত এই পণ্যগুলির ক্রেতা হিসাবে সাধারণ মানুষ নয়, শুধুমাত্র ধনীদেরই চিহ্নিত করা উচিত। তবেই শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টির ন্যায্য দাম পাবেন।

হাতে বোনা তাঁতের সুনিশ্চিত আশ্বাস

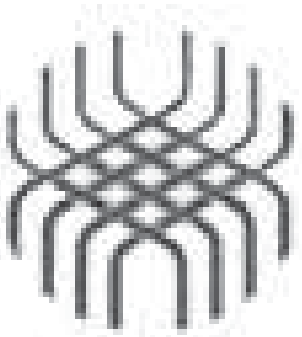

হস্তচালিত
তাঁতের প্রতীক

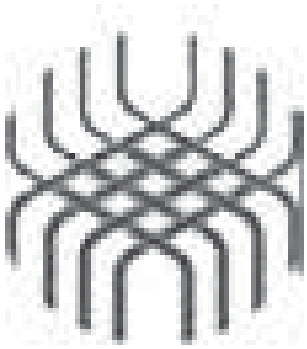

ভারতে
হাতে বোনা

হস্তচালিত তাঁত শিল্পের সামনে আজ সব থেকে বড় বিপদ হল যন্ত্রচালিত তাঁত এবং সুলভ আমদানি। যন্ত্রচালিত তাঁতের কাপড় সস্তা এবং সহজে ও দ্রুত এর উৎপাদন করা যায়। যাঁর কোনও ধারণা নেই, তিনি হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত তাঁতের কাপড়ের মধ্যেকার তফাতও ধরতে পারবেন না। এর সুযোগ নিয়ে দুর্নীতিও চলে। হস্তচালিত তাঁতের নাম করে যন্ত্রচালিত তাঁতে তৈরি কাপড় বিক্রি করা হয়। এ জন্য অবিলম্বে ব্র্যান্ডিং করা দরকার। হ্যান্ডলুম ব্র্যান্ডের কাপড় ক্রেতাকে নিশ্চয়তা দেবে যে, এটি হাতেই বোনা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ মানুষ এখনও এই ব্র্যান্ডের সঙ্গে তেমন পরিচিত নন। তাই বিজ্ঞাপনের সাহায্যে এই ব্র্যান্ডকে সুপরিচিত করে তুলতে হবে। দেশ-বিদেশে সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত হস্তশিল্প মেলায় যাতে একমাত্র হ্যান্ডলুম ব্র্যান্ডের কাপড়ই প্রদর্শিত হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এতে সচেতনতা যেমন বাড়বে, তেমনি হস্ততাঁত শিল্পীরা বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল ভোগ করবেন।

সামাজিক প্রভাব, ঐতিহ্য এবং হাতে বোনা জিনিসের প্রতি ভালোবাসা হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবে। তবে এই কৌশল কেবল সুদক্ষ তাঁতশিল্পীদের জন্যই, যাঁদের সঙ্গে যুক্ত ডিজাইনাররা এবং যাঁদের ক্রেতা সমাজের ওপরতলার মানুষজন। সুদক্ষ এই শিল্পীরা মোট তাঁতশিল্পীর সংখ্যার ২০ শতাংশ। এঁরাই মহার্ঘ তাঁতবস্ত্রে ৮০ শতাংশ তৈরি করেন। বাকি ৮০ শতাংশ তাঁতশিল্পীর জন্য অন্য ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে।

বিপুল কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ এবং তার মোকাবিলায় গৃহীত কিছু ব্যবস্থা

আমাদের ভুললে চলবে না, হস্তচালিত তাঁত শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৪৩ লক্ষেরও বেশি মানুষের জীবিকা জড়িত। তাঁদের সবাইকে রাতারাতি প্রশিক্ষণ দিয়ে সুদক্ষ করে তোলা সম্ভব নয়।

হস্তচালিত তাঁতের সামনে বড় বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছে যন্ত্রচালিত তাঁত। অনেক সহজে ও কম সময়ে হাতে বোনা বস্ত্রের নকল করে ফেলা যাচ্ছে এখানে। কিছু তাঁতশিল্পী বেশি উৎপাদনের লক্ষ্যে যন্ত্রচালিত তাঁতের শরণাপন্ন হয়েছেন। এতে তাঁদের উৎপাদনের গতি ও দক্ষতা বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু এর জেরে বহু মানুষের কর্মচ্যুত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যেসব মানুষের কাছে বিকল্প জীবিকায় যাবার সুযোগ ও সম্পদ নেই, বা সামর্থ্য নেই যন্ত্রচালিত তাঁত কেনার, তাঁরা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। দেশে বিদ্যুতের বিপুল ঘাটতি থাকায়, যন্ত্রচালিত তাঁতের সদ্ব্যবহার নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

হাতে বোনা তাঁতের পণ্য

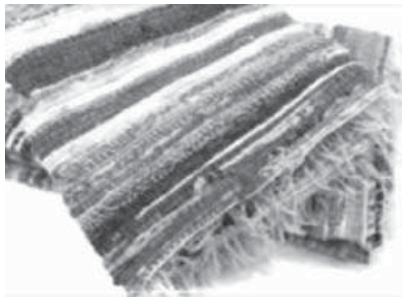

এই প্রেক্ষাপটে, হস্তচালিত তাঁতশিল্প এবং এর সঙ্গে জড়িত লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা বাঁচাতে উপযুক্ত প্রকল্প প্রণয়ন করা একান্ত আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, হস্তচালিত তাঁত, বৃহদাকার উৎপাদন ও উন্নয়নের পরিপন্থী। আমি জোর দিয়ে বলব, দুটি ক্ষেত্রই সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে দুটির প্রেক্ষিত সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ায় এদের উন্নয়নে পৃথক কৌশল নেওয়া দরকার। এদের সম্পর্ক প্রতিযোগিতার নয়, এরা একে অপরের পরিপূরক। একটির উদ্দেশ্য বিশ্বময় বস্ত্রের জোগান দেওয়া, অপরটির লক্ষ্য লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান। দুটি ক্ষেত্রের প্রসারে সহায়তা করা আমাদের সরকারের নীতি।

হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে যন্ত্রের আগ্রাসন থেকে বাঁচাতে ১৯৮৫ সালে হস্তচালিত তাঁত (উৎপাদন সংক্রান্ত সংরক্ষণ) আইন পাশ হয়েছে। এর আওতায় ১১টি সামগ্রী শুধুমাত্র হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদনের জন্য সংরক্ষিত। এগুলি যন্ত্রের মাধ্যমে তৈরি করা যাবে না। নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে জরিমানার সংস্থান রয়েছে।

জাতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগমের মাধ্যমে সরকার তাঁতশিল্পীদের ভরতুকিতে সুতো দেবার ব্যবস্থা করেছে। তাঁতশিল্পীরা যাতে ন্যায্য দামে প্রয়োজনীয় সুতো পান, সে জন্য অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রী আইনের আওতায় বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনা অনুসারে, সুতো উৎপাদক কারখানাগুলি তাদের উৎপাদনের একটা নির্দিষ্ট অংশ তাঁতিদের দিতে বাধ্য।

কারখানাগুলির পক্ষ থেকে এই দুটি ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধিতা করা হলেও এগুলি জারি রাখা একান্ত আবশ্যক। অসহায় হস্তচালিত তাঁত শিল্পক্ষেত্র এগুলির মাধ্যমে কিছুটা সুরক্ষা পায়। বরং এই নিয়মগুলি যাতে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা হয়, তা সুনিশ্চিত করা দরকার।

এই ক্ষেত্রের আর একটি উদ্বেগের বিষয় হল ঋণের জোগান। তৃতীয় শুমারিতে দেখা গেছে, তাঁতশিল্পীদের ৬১ শতাংশ স্বাধীন, ৩৪ শতাংশ কাজ করেন বেসরকারি মালিকের অধীনে এবং মাত্র ৫ শতাংশ প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁতশিল্পীদের কাছে যথেষ্ট টাকা থাকে না। মধ্যস্বত্বভোগীরা তাঁতশিল্পীদের পরিশ্রম অনুযায়ী টাকা দেন না। অল্পশিক্ষিত, সহায় সম্বলহীন এই শিল্পীরা প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের সুবিধাও পান না।

তাঁদের এই আর্থিক অসহায়তা বুঝে সরকার ২০১১ সালে তাঁতশিল্পী ও সমবায় সংস্থাগুলির ঋণ মকুবের জন্য ৩০০০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল রুদ্ধ হয়ে যাওয়া ঋণের পথ খুলে ফের তাঁতশিল্পীদের ঋণ গ্রহণের উপযুক্ত করে তোলা। অত্যন্ত উদার নির্দেশিকা থাকা সত্ত্বেও সব রাজ্য মিলিয়ে মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করা সম্ভব হল। সমবায় সমিতিগুলি ছাড়া এর সুফল পেলেন মাত্র ৫০ হাজার তাঁতশিল্পী। এই ঘটনা অনেকেরই চোখ খুলে দিল। বোঝা গেল, গত কয়েক দশকে এই শিল্পে ঋণ বিশেষ দেওয়াই হয়নি। এর প্রেক্ষিতে সরকার ৬ শতাংশ সুদে এই শিল্পক্ষেত্রে ঋণ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। ভরতুকিযুক্ত এই ঋণ চলতি মূলধনের পাশাপাশি মূলধনি সম্পদ সৃষ্টির কাজেও লাগানো যেতে পারে। সঠিকভাবে রূপায়িত হলে এই প্রকল্প গোটা শিল্পের চেহারা বদলে দিতে পারে। রুগ্‌ণ, অবলুপ্ত হতে বসা হস্ততাঁত শিল্পকে নতুন জীবনীশক্তি দিতে পারে এই প্রকল্প।

শুমারিতে দেখা গেছে, তাঁতশিল্পীদের ৮৩ শতাংশেরই শিক্ষাগত মান দ্বাদশ শ্রেণির নীচে। এ থেকে একটা ধারণা জন্মায় যে এই শিল্প বোধহয় কেবল স্বল্পশিক্ষিতদের জন্যই। এতে পেশাগত গৌরবের কোনও বোধ থাকে না। পরবর্তী প্রজন্মকে এই পেশায় রাখতে হলে হস্তচালিত তাঁতশিল্পকেও শিল্পকলা, ফোটোগ্রাফি, সংগীতের মতো আধুনিক পেশা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর প্রথম ধাপ হল, NIFT-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিতে হস্তচালিত তাঁতের প্রশিক্ষণ শুরু করা। NIFT-এর প্রশিক্ষণ তাঁতশিল্পীদের আরও দক্ষ ও বাজার উপযোগী করে তুলবে, পাশাপাশি প্রখ্যাত এই প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া শংসাপত্র তাঁদের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে গর্ব ও আত্মবিশ্বাস। মনে রাখতে হবে, এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে দক্ষতা হস্তান্তরের মাধ্যমেই এই শিল্প বেঁচে রয়েছে। তাই পরবর্তী প্রজন্মকে এই পেশার প্রতি আকর্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হস্তচালিত তাঁত আইন, ১৯৮৫-র ২বি ধারায় বলা হয়েছে, "যন্ত্রচালিত ছাড়া অন্য যে কোনও ধরনের তাঁতকেই হস্তচালিত বলা যাবে।" ভারতীয় মানক ব্যুরোর দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী "হস্তচালিত তাঁত বলতে বোঝায় হাতে চালানো যন্ত্রে কাপড় বোনা। কখনও এই যন্ত্র পায়ের সাহায্যেও চালানো যায়।"

তাঁত বয়নের তিনটি পর্যায় আছে। প্রথমে নকশা অনুযায়ী সুতোগুলি আলাদা করে নেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন ধরনের সুতো এক জায়গায় এনে শেষে কাপড় বোনার কাজ চলে। এই তিনটি ধাপই বিদ্যুতের সাহায্য ছাড়া করা হয়। বিদ্যুতের সাহায্য না নিয়েই এগুলি যন্ত্রের মাধ্যমে করা যেতে পারে। এই বিষয়টি নিয়ে এখনও সেভাবে ভাবনাচিন্তা করা হয়নি। এ ক্ষেত্রে গবেষণা হলে, তাঁতশিল্পীদের পরিশ্রম কমবে, অথচ হাতে বোনার সূক্ষ্মতাও নষ্ট হবে না।

এই নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল বিতর্ক চলছে। ২০১৩ সালে পরিকল্পনা কমিশন বলে, "বয়নের কোনও একটি পর্যায় হাতে করলেই তাকে হস্তচালিত তাঁত বলা যেতে পারে।" মন্ত্রকের পক্ষ থেকে মিশ্র তাঁত ব্যবহারের কথা বলা হয়। কিন্তু তাঁতশিল্পীরা এই প্রস্তাবের

বিরোধিতা করেন। শুরু হয় বিক্ষোভ। আমি এই বিরোধিতাকে যুক্তিসংগত মনে করি। এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে তা ভবিষ্যতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পকে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেবে। হস্তচালিত তাঁতের নামে যেসব পাওয়ারলুম এখন চালাবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাই বাজার ছেয়ে ফেলবে। সৌভাগ্যের বিষয়, ২০১৪ সালে বস্ত্রবয়ন মন্ত্রক হস্তচালিত তাঁতের পুরনো সংজ্ঞাই ফিরিয়ে আনে। তবে কায়িক পরিশ্রম কমানো এবং উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এই সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করে দেখার সুপারিশও মন্ত্রকের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে।

আমার মনে হয়, বর্তমান সংজ্ঞায় যন্ত্রের ব্যবহারের সঙ্গে কোনও বিরোধ নেই, যন্ত্র মানেই তা বিদ্যুতে চলবে, এমন তো নয়। বিদ্যুৎবিহীন যন্ত্র ব্যবহার করেও পরিশ্রম কমানো এবং উৎপাদনের গতি বাড়ানো যায়।

সত্যি বলতে কী, তাঁতই তো একটা যন্ত্র। কিন্তু প্রথাগত তাঁতের কাঠামো বিজ্ঞানসম্মত নয়। এর জেরে কায়িক পরিশ্রম অনেক বেশি হয়, উপার্জন হয় কম। শুধু তাই নয়, সমীক্ষায় দেখা গেছে, ক্রমাগত এই প্রক্রিয়ায় থাকলে শারীরিক অবনতি হয়, চাপ পড়ে তাঁতশিল্পীর হাত, হাতের তালু ও পায়ের স্নায়ুর ওপর।

গবেষণা সেভাবে না হওয়ায় হস্তচালিত তাঁতশিল্পে প্রযুক্তির অভিষেক হয়নি। প্রথাগত পদ্ধতিই চলে আসছে। এই শিল্প থেকে গেছে শ্রমনির্ভর ও কম উৎপাদনশীল।

উৎপাদন বাড়াতে উদ্ভাবন ও আধুনিকীকরণ অপরিহার্য। যন্ত্রের সাহায্য নিলে তাঁতির দক্ষতা ও তাঁতবস্ত্রের সৌকর্য—দুই-ই বাড়বে। এর প্রথম ধাপ হল ১৭৭৩ সালে জন কে-র আবিষ্কৃত ফ্লাইং শাটলের ব্যবহার। এরপর ডবি ও জ্যাকার্ড-এর মতো আরও নানা কারিগরি এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হয়েছে। সলিড বর্ডারের জন্য এসেছে 'এস পি এম স্লে' ও 'ক্যাচ কর্ড সিস্টেম'। এক সঙ্গে অনেক বুটি বোনার জন্য রয়েছে 'মাল্টি বুটি স্লে'।

তাঁতশিল্পক্ষেত্রে ছোট ছোট সংস্থা যদি বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করতে চায়, তাহলে তাদের অনেক বেশি সময় লাগবে। বাণিজ্যিক উৎপাদনের চাহিদাকে গার্হস্থ্য উৎপাদনের সঙ্গে মেলানো যায় না, এক্ষেত্রে সেমি-অটোম্যাটিক তাঁত বিশেষ কার্যকর হতে পারে। কাঠ বা বাঁশের বদলে ব্যবহার করা যেতে পারে 'রোলার টেম্পল'।

তাঁতশিল্পে গবেষণার ওপর জোর দেওয়া দরকার। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, ডিজাইন ও উৎপাদন পদ্ধতিতে যুগান্তর এনে দিতে পারে। কায়িক পরিশ্রম, শক্তি ও সময়ের সাশ্রয় করা একান্ত জরুরি।

নতুন প্রযুক্তির রূপায়ণ এক্ষেত্রে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে সমস্যা হল, তথ্য সহজে না পাওয়া। অন্যদিকে, তাঁতশিল্পীরাও সহজে তাঁদের সুপ্রাচীন প্রথাগত উৎপাদন পদ্ধতি থেকে সরতে চান না। এ জন্য তাঁদের প্রতিটি সরকারি প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে হবে। গবেষণার সুফল তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারলে বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বাড়বে উৎপাদনশীলতা।

বাণিজ্যিক উৎপাদনের আর একটা সমস্যা হল এর বিপণন। এক্ষেত্রেও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। তাঁতশিল্পক্ষেত্র থেকে দাবি উঠেছে একে মহাত্মাগান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিশ্চয়তা আইন (MGNREGA)-র সঙ্গে সংযুক্ত করার। প্রস্তাবটি ভেবে দেখার মতো। বর্তমানে সরকার স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বিনামূল্যে পোশাক দেয়। এ ক্ষেত্রে হাতে বোনা তাঁতের পোশাক বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। তাঁতশিল্পীদের MGNREGA-র আওতায় নথিভুক্ত করে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের কাপড় উৎপাদনের বরাত দেওয়া যায়। সেই পোশাক স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করা হবে।

গবেষক ও বিজ্ঞানীদের কাছে চ্যালেঞ্জ হল, এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা, যাতে হস্তচালিত তাঁতশিল্পের উৎপাদন ভিত্তি বিস্তৃত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ঘটে অথচ এর USP (ইউনিক সেলিং প্রপোসিশন বা বিক্রয়ের জন্য অনন্য প্রস্তাব/গুণ) নষ্ট না হয়। হাতে বোনা তাঁতের বৈশিষ্ট্য ও আবেগ রক্ষা করা আমাদেরই দায়িত্ব।❑

[লেখক ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের আধিকারিক। বয়ন শিল্প ক্ষেত্রে ওনার ৭ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। বস্ত্রবয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম-সচিব ছিলেন প্রায় ৬ বছর। এ ছাড়াও হস্তচালিত তাঁত ও হস্তশিল্পের উন্নয়ন-কমিশনারের দপ্তরগুলোর পাশাপাশি NIFT-র প্রধান অধিকর্তার দপ্তরের অতিরিক্ত ভারও তাঁর ছিল।
email : monikasgarg@gmail.com]

WBCS কাউকে খালি হাতে ফেরায় না

রাজ্য সরকারের শীর্ষ পদগুলিতে নিয়োগ হয় WBCS -এর মাধ্যমে। সেই অর্থে WBCS-কে প্রশাসনের প্রবেশদ্বারও বলা চলে। WBCS কিন্তু মোটেই কঠিন পরীক্ষা নয়, একটু দীর্ঘমেয়াদি এই যা। প্রিলি হোক বা মেন-এগোতে হবে সুপরিকল্পিতভাবে। আনডিফাইন্ড সিলেবাসকে সংক্ষিপ্ত করে আনতে হবে হাতের মুঠোর মধ্যে। এটা করা কিন্তু সত্যিই সম্ভব। এর জন্য দরকার জহুরির চোখ আর জাজমেন্ট ক্ষমতা। কি কি পড়তে হবে তা জানবার আগে জানতে হবে কি কি পড়তে হবে না। সবার আগে অফ স্টাম্পের বাইরের বলগুলিকে ছাড়তে শিখতে হবে। প্রিলির জন্য ভূগোল, বিজ্ঞান, সংবিধান ইত্যাদি বইগুলি হতে কেবলমাত্র ২০-৩০ শতাংশ পড়তে হবে আর বাদ দিতে হবে ৭০-৮০ শতাংশ। অর্থাৎ, প্রিলির সীমাহীন সিলেবাস হতে কেবলমাত্র relevant অংশগুলির ওপরই জোর দিতে হবে। তাতে সময় ও শ্রম—উভয়েরই সাশ্রয় হবে। ঠিক এই কারণেই একজন সুদক্ষ গাইডের প্রয়োজন, যারা পারবে ছাত্রছাত্রীদের প্রস্তুতির সঠিক এবং শর্টকাট রাস্তার সন্ধান দিতে। বাজারে বহু কোচিং সেন্টার থাকলেও WBCS-এর ব্যাপারে ফোকাসড এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের বড়ই অভাব। কেবলমাত্র এমন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের কাছেই WBCSটা সত্যিই সহজ। প্রিলিকে বলা হয় WBCS-এর সবচেয়ে কঠিন পর্যায়। মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি ও চতুরতা সুসমন্বয়ে পড়াশুনা করলে প্রিলি পাশ করাটা মোটেই কষ্টকর নয়।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা কেবলমাত্র WBCSই পড়ায়। পুরো কোর্সটির পরিচালনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে WBCS অফিসারদের দ্বারা গঠিত Honorary Advisory Council-এর উপর। খুব অল্প পড়ে কিভাবে অতি সহজে প্রিলি পাশ করা যায় তা আমাদের ফ্যাকাল্টির ছাত্রছাত্রীদের হাতে ধরে শিখিয়ে দেন।

এখনকার WBCS কোর্সটি এমনভাবে সিডিউল করা হয়েছে যার দ্বারা কেন্দ্র এবং রাজ্যের CGL, FCI, পুলিশ কনস্টেবল, জেল পুলিশ, SI, Clearkship, Gr.-D, Staff Selection ইত্যাদি পরীক্ষাতেও সাফল্য মেলে অতি সহজেই। কারণ WBCS হল উঁচু দরের পরীক্ষা। এই পরীক্ষার জন্য প্রায় ১২-১৪টি বিষয় পড়াশুনা করতে হয়। কিন্তু WBCS ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষার মাত্র ৪-৫টি বিষয় থেকে প্রশ্ন আসে। সুতরাং কোন একটা ছোটোখাটো চাকরির কথা না ভেবে WBCS কে টার্গেট করলে, WBCS ছাড়াও বাকি চাকরিগুলি পাওয়া যায় হেসেখেলে। তাই লক্ষ্য রাখতে হবে উঁচুতে, তাহলে সাফল্য না এসে পারবে না। WBCS গাইডেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন যে সবার সেরা তা এখানকার চমকপ্রদ সাফল্যেই প্রমাণিত। বিগত চার-পাঁচ বছরে এখান থেকে ৫০০ জনেরও বেশি WBCS অফিসার তৈরি হয়েছে। এবার আপনার পালা। আপনার নিষ্ঠা, জেদ, পরিশ্রম এবং আমাদের সঠিক গাইডেন্স রচিত হবে আপনার সাফল্যের ইমারত।

WBCS-2016-এর ব্যাচে ভর্তি চলছে। এখানে পাবেন WBCS টপারদের টিপস এবং বিশেষ স্ট্র্যাটেজিক ক্লাশ। আসনসংখ্যা সীমিত।

কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার অর্থ শুধুমাত্র কোর্স ফি প্রদান করা নয়, নিজের ভবিষ্যতটাকেও তাদের হাতে সমর্পণ করা। তাই কোথাও ভর্তির আগে দশবার ভাববেন। একটা ভুল সিদ্ধান্ত আপনার কেরিয়ারকে বরবাদ করে দিতে পারে।

?? অপশনাল নিয়ে বিভ্রান্ত ??

WBCS গ্রুপ-'A' এবং 'B'-তে সাফল্যের চাবিকাঠি হল অপশনাল। এ হেন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে সব দিক বিবেচনা করে। বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমেই একমাত্র তা সম্ভব। এমনই এক কাউন্সেলিংয়ে যোগদান করতে OPT লিখে নিজের নাম SMS করুন ৯৬৭৪৪৭৮৬৪৪ নম্বরে।.

As far as WBCS is concerned, Labour, Patience & Confidence are the three pillars of success. An advice to all those preparing for WBCS–"Be positive in your approach and you will definitely taste success one day". I have got a lot of help and advice from Academic Association. The mock interview classes were very effective and helped me to confront my fears.

– Rohed Shaikh, Executive, Rank-4, WBCS-13

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের এনভায়রনমেন্ট আমাকে ডাইভার্জেন্ট থিঙ্কিং করতে শিখিয়েছে। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ, সকল স্যারদের আন্তরিক সাহায্য আমাকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে। এখানকার প্রতিটি বিষয়ের স্টাডি ম্যাট, প্রতিদিনের ক্লাসটেস্ট এবং বিশেষ করে মক টেস্টগুলি এক কথায় সুপার্ব। আমি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘায়ু ও সাফল্য কামনা করছি।

— **চন্দ্রনাথ মণ্ডল**, সিডিপিও, ডব্লুবিসিএস-২০১৩

পোস্টাল কোর্স

দূরবর্তী ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে আমাদের 'Inclusive Postal Course'। পাবেন প্রিলি ও মেনসের প্রতিটি বিষয়ের ওপর কমনযোগ্য উৎকৃষ্ট মানের নোটস। সঙ্গে থাকছে অজস্র ক্লাশ টেস্ট এবং মকটেস্ট। নোটসগুলি তৈরি করেছেন ডব্লুবিসিএস বিশেষজ্ঞরা এবং সম্পাদনা করেছেন সামিম সরকার। মেদহীন, টু দ্য পয়েন্ট, আপ-টু-ডেট এবং কোয়ালিটি নোটসগুলি আপনার সাফল্যকে সুনিশ্চিত করবে। সঙ্গে থাকছে বেশ কিছু ক্লাশ করার সুযোগও। **কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে না চাইলে আপনার নিশ্চিত গন্তব্য হবে অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন।**

WBCS স্ক্যানার

ডব্লুবিসিএস-এর ইতিহাসে এই প্রথম বিগত ১৭ বছরের ডব্লুবিসিএস প্রিলির সম্পূর্ণ সমাধান, সঙ্গে প্রশ্ন বা অপশনের প্রাসঙ্গিক তথ্য। প্রশ্নগুলিকে প্রথমে বিষয়ভিত্তিক ও পরে টপিক ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে। বইটি সম্পাদনা করেছেন **সামিম সরকার।**

এছাড়াও রয়েছে—

- ☑ বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নের ক্ষেত্রভিত্তিক বিশ্লেষণ
- ☑ সাফল্যের স্ট্র্যাটেজি
- ☑ মডেল মক টেস্টের সেট

বইটি প্রকাশিত হবে ২০শে নভেম্বর, ২০১৫

Academic Association

The Self Culture Institute, 53/6 College Street (College Square), Kolkata-700073

9830770440
9674478644

Website : www.academicassociation.in . Centre : Uluberia-9051392240 . Birati-9674447451 . Darjeeling-9832041123 . Berharampur-9775333007

বি | শে | ষ | নি | ব | ন্ধ

গান্ধীজির আর্থ-সামাজিক ভাবনায় দক্ষ, সমৃদ্ধ ভারত

গান্ধীজিকে আমরা কখনও মহাত্মা, কখনও জাতির জনক বলে স্মরণ করি। কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর অবদানের পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর মতাদর্শের প্রাসঙ্গিকতাও অনস্বীকার্য। বর্তমান ভারতে গান্ধীবাদী মতাদর্শের সর্বাত্মক প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন **ভব রায়।** *এ ছাড়াও, দক্ষতা উন্নয়ন ক্ষেত্রে গান্ধীজির দর্শনের ভূমিকার দিকেও বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে এই নিবন্ধে।*

মহাত্মা গান্ধীর বহুমাত্রিক পরিচিতি সম্পর্কে সম্ভবত নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি ছিলেন এক অর্থে, পরাধীন ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম জননেতা। এ ছাড়াও, সত্য-অহিংসা-শান্তির পূজারি তথা 'দার্শনিক' রূপেও তাঁর বিশ্ব-পরিচিতি অমর রয়েছে। কিন্তু ঘটনা হল—গান্ধীজির এত সব বহুল-চর্চিত বিষয়ের মধ্যে তাঁর যে দিকটি নিয়ে সবচেয়ে কম আলোচনা হয়ে থাকে, তা হল—তাঁর অর্থনৈতিক বা আর্থ-সামাজিক ভাবনা-চিন্তা। অথচ, এই বিশেষ দিকটিতেও তাঁর ভাবনা-চিন্তা এতটাই মৌলিক, গঠনমূলক ও সুদূরপ্রসারী ছিল যে, ইতিহাসের নিরিখে তো বটেই, এমনকী বর্তমান বা ভবিষ্যতের প্রাসঙ্গিকতাও তা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে। তাঁর আর্থ-সামাজিক ভাবনা-চিন্তা, মত ও পথ নিয়ে হয়তো অংশত বিতর্ক বা সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাঁর এই ভাবনা বর্তমান জাতীয় অর্থনীতি ও বিভিন্ন সামাজিক স্তরে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বহুল পরিমাণেই।

এ প্রসঙ্গে অবশ্যই কয়েকটি কথা মনে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি নিশ্চিতভাবেই কোনও অর্থনীতিবিদ ছিলেন না। প্রাথমিক ও প্রধান পরিচিতির সূত্রে তিনি অবশ্যই ছিলেন একজন উচ্চতম স্তরের জননেতা—যাঁর জীবনভর সাধনাই ছিল অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে পরাধীন মাতৃভূমিকে বিদেশি-শাসনের শৃঙ্খল-মুক্ত করা। কিন্তু, এটাও অনস্বীকার্য যে, বছরের পর বছর দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তাঁর রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঝে দেশ ও দেশবাসীর বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার কথাও তাঁকে ভাবতে হয়েছে, দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখে সুনির্দিষ্ট পথের দিশাও তিনি দেখিয়েছিলেন নানাভাবে, এমনকী বহু ক্ষেত্রেই সে সবের 'হাতে-কলমে' বা প্রয়োগগত রূপও দিয়েছিলেন। তাই, আমরা দেখেছি—'স্ব-রাজ' ছিল যেমন তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রামের অহরহ-বীজমন্ত্র, তেমনি পাশাপাশি, দেশ ও দেশবাসীর স্ব-নির্ভরতা, গ্রামোন্নয়ন-সমবায়-পঞ্চায়েত-ভাবনা, এমনকী সমগ্র দেশবাসীর স্বচ্ছ, সচেতন স্বাস্থ্যবিধান সম্পর্কেও তাঁর বিভিন্ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা আজও সমান মূল্যবান হয়ে রয়েছে।

গান্ধীজির অর্থনৈতিক ভাবনা : গ্রামোদ্যোগ, গ্রামীণ শিল্প এবং প্রসঙ্গত

একথা সম্ভবত সকলের জানা—গান্ধীজির আর্থ-সামাজিক চিন্তার মূল কেন্দ্রে ছিল তাঁর 'গ্রামভাবনা'। কিন্তু, তাঁর এই গ্রামভাবনার শাখা-প্রশাখা এতটাই গঠনমূলক ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সদর্থক সম্ভাবনাময় ছিল যে তা চূড়ান্ত পর্যায়ে আর শুধুমাত্র গ্রাম-সর্বস্বতায় সীমাবদ্ধ থেকে যায়নি। বরং বলা যায় সেই সময়ের প্রায়-সর্বাত্মক 'গ্রামীণ ভারতবর্ষ' এবং চলমান ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণকে মনে রেখে, সমগ্র দেশ ও দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক পুনরুজ্জীবন ও প্রগতিকে সুনির্দিষ্ট 'লক্ষ্য' হিসাবে রেখে তাঁর মৌলিক অর্থনৈতিক রূপরেখার প্রণয়ন করেছিলেন। এখন দেখা যাক সংক্ষিপ্তভাবে কী ছিল সেই রূপরেখার মূল বিষয়বস্তু। তৎকালীন 'হরিজন' পত্রিকাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি নিজের মুখেই তার সংশ্লিষ্ট ভাবনা প্রকাশ করেছিলেন। 'হরিজন' পত্রিকার ২০ নভেম্বর ১৯৩৪ তারিখের সংখ্যায় 'গ্রামোদ্যোগ' সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "...আমরা যেসব জিনিস ব্যবহার করি, সেগুলি গ্রামে তৈরি হলেই আমরা কিনব।...কিন্তু বিদেশি জিনিস, এমনকী শহরের বড় বড় কারখানায় তৈরি জিনিস দেখতে আরও ভালো হলেও গ্রামের তৈরি জিনিসকে তুচ্ছ করব না। অন্য কথায় বলতে গেলে, আমরা গ্রামবাসীদের শিল্পপ্রতিভা স্ফুরণের সহায় হব।...এই চেষ্টায় সফল হতে পারব, না পারব না সে চিন্তায় কখনও আমরা ভীত হয়ে পড়ব না। আমাদের নিজেদের কালেই এমন সব ঘটনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি, যে ক্ষেত্রে কাজের কঠিনতা দেখে আমরা পিছিয়ে যাইনি, কারণ জাতির অগ্রগতির জন্য সেগুলি অত্যাবশ্যক বলে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। কাজেই আমরা যদি ব্যক্তিগতভাবে বুঝতে পারি যে, ভারতীয় গ্রামগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা আমাদের বেঁচে থাকার পক্ষে অত্যাবশ্যক, যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, কেবল সেই উপায়েই আমরা অস্পৃশ্যতার মূলোৎপাটন করতে পারি এবং ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে নিজদিগকে এক বলে ভাবতে পারি, তাহলে আন্তরিকভাবে আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে হবে ও গ্রামবাসীদের সামনে শহুরে জীবনযাত্রা না ধরে, গ্রামগুলিকে আমাদের আদর্শ করে তুলতে হবে।..."

মহাত্মা গান্ধীর 'গ্রামভাবনা' তথা সমগ্র অর্থনৈতিক চিন্তার অতি সামান্য অংশের দৃষ্টান্তস্বরূপ এই উদ্ধৃতি। তবুও, একটু মনোযোগ দিয়ে তাঁর এই কথাগুলি পড়লে যে কোনও মানুষই বুঝবেন, কত গভীর ও পরিব্যাপ্ত মননে-প্রজ্ঞায় সম্পৃক্ত ছিলেন এই মানুষটি। এক কথায় বলা যায়, তাঁর এ ধরনের উক্তি আপাতভাবে শুনতে যতটাই সহজ, অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুতে তা ঠিক ততটাই গভীর থেকে গভীরতর তাৎপর্যবাহী। তাঁর

উচ্চারিত প্রাসঙ্গিক প্রতিটি শব্দকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলেই তবে তার বক্তব্যের প্রকৃত মর্মার্থ বোঝা যাবে।

এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন, আজ থেকে প্রায় ৮০-৮৫ বছর আগে। সেই সময়ের পরাধীন ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীদের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই পর্বে দেশের প্রায় শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ মানুষই বাস করতেন গ্রামে। আর এই গ্রামবাসীদের ৮০-৮৫ শতাংশই ছিলেন দরিদ্র বা হত-দরিদ্র, এখনকার অর্থনীতির পরিভাষায় যাকে বলা যায় দারিদ্র-সীমারেখার নীচে, অনেক নীচে ছিল তাদের অবস্থান। কিন্তু ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার আগে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনেক গ্রামাঞ্চলই ছিল জীবন ও জীবিকার সামগ্রিকতাতে বহুলাংশেই স্বয়ম্ভর (তাদের অতি-সীমিত অভাব ও চাহিদার প্রেক্ষিতে)। আর, ঐতিহাসিকভাবে এটাও সম্ভবত সকলেরই জানা—সেই আমলের ভারতের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অসংখ্য জনজাতি ও জাতিগোষ্ঠীর মানুষেরা ঐতিহ্যগতভাবেই ছিলেন নানা জাতের নিপুণ হস্তশিল্পী বা কুটির শিল্প কারিগর।

কিন্তু, এ দেশে ইংরেজ শাসন শুরু হওয়ার পর থেকে, বিশেষত আঠারো-উনিশ শতক থেকে খুবই পরিকল্পিতভাবে ব্রিটিশ শাসকদের তরফ থেকে ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী দেশীয় গ্রামীণ হস্তশিল্পকে ধ্বংস করার কাজ চলেছিল। এইভাবে, বিশ শতকের গোড়াতেই ভারতের গ্রামগুলি হয়ে দাঁড়াল ছিন্নমূল, হতশ্রী এবং কোটি কোটি বৃত্তিচ্যুত, চরমতম দারিদ্র লাঞ্ছিত জীবন্ত বিভীষিকা-স্বরূপ। পরাধীন ভারতের এই গ্রামীণ হস্তশিল্পের ধ্বংসের প্রামাণ্য বিবরণ রয়েছে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে। দেশের এই তৎকালীন বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করে গান্ধীজি সঠিকভাবেই অভিমত দিয়েছিলেন, গ্রামীণ ভারতের পুনরুজ্জীবন তথা 'স্বদেশি-গ্রহণ' ও 'বিদেশি-বর্জন'-এর পথ ছাড়া আর কোনও ইতিবাচক বিকল্প নেই—সমগ্র দেশবাসীর আর্থ-সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে। পূর্বোক্ত গান্ধীজির উক্তিতে আরও লক্ষণীয় যে, নিরক্ষর-হতদরিদ্র স্বদেশবাসীর প্রতি কী অসামান্য সম্মানজনক তাঁর মন্তব্য, '...আমরা গ্রামবাসীদের শিল্পপ্রতিভা স্ফুরণের সহায় হব।' এখানে, 'শিল্প প্রতিভা স্ফুরণের' শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে দরিদ্রতম গ্রামবাসীর বিশেষ ধরনের 'দক্ষতা'-কেও স-সম্মান স্বীকৃতি দিতে তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষভাবে অনুধাবন করার মতো। গ্রাম-পুনরুজ্জীবনের আর্থ-সামাজিক প্রস্তাবনার সঙ্গে কী চমৎকারভাবে তিনি সংযুক্ত করলেন তাঁর অস্পৃশ্যতাবিরোধী এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সারাৎসারকে। এখানে যেন গান্ধীকে খুঁজে পাওয়া যায় একজন আধুনিক 'সমাজতাত্ত্বিক' রূপে। সামাজিক প্রগতির সূত্রে যদি সমাজের কোনও পিছিয়ে থাকা অংশের ক্ষমতায়ন ঘটে, তাহলে সংশ্লিষ্ট সামাজিক স্তরে রক্ষণশীলতা-মুক্ত, উদারনৈতিক মূল্যবোধেরও বিকাশ ঘটাতে থাকে। তবে, এই সব তথাকথিত তাত্ত্বিকতার ঘেরাটোপের বাইরে ছিল তাঁর সামগ্রিক অবস্থান। অর্থনীতি-ভাবনা তাঁর কাছে কোনও পৃথক বা স্বতন্ত্র বিষয় ছিল না। অর্থনীতি হোক, রাজনীতি হোক, অথবা হোক তা সমাজতত্ত্ব বা নীতিশাস্ত্র—সবকিছু মিলিয়েই ছিল তাঁর জীবন-দর্শন—কোনওটা থেকে কোনওটাই বিচ্ছিন্ন ছিল না, আবার কোনওটাই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। আসলে, এই সবকটি উপাঙ্গের ওতপ্রোত মিলনে-মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল সামগ্রিক, অনন্য এক দার্শনিক সত্তা, যা সারা বিশ্বে 'গান্ধী-দর্শন' (গান্ধীয়ান ফিলোসফি) হিসাবে চিরায়ত পরিচিতি ও খ্যাতিলাভ করেছে।

এই প্রসঙ্গে, তাঁর আরও একটি অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "...শহরবাসীর কাছে গ্রাম অস্পৃশ্য হয়ে উঠেছে। সে গ্রামের বিষয় কিছু জানে না, সে গ্রামে বাস করে না, যদি দৈবাৎ গ্রামে যায় তো সে সেখানে শহুরে চালচলন চালু করতে চায়। এটাও সহ্য করা যেত, যদি আমরা ৩০ কোটি মানুষকে স্থান করে দিতে পারে এতগুলি শহর তৈরি করতে পারতাম।...এক খাদি কর্মীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমি বুঝলাম, গ্রামবাসীদের কাছ থেকে শহরবাসীরা যে সম্পদ নির্দয়ভাবে ও নির্বোধভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে, তা তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে পারে এমন একটা সংস্থা হওয়া কত দরকার।"

দেশের গ্রাম ও গ্রামীণ শিল্প সম্পর্কে, প্রায় একশো বছর আগের চরম ক্ষয়িষ্ণু বাস্তবতার এই যে নির্মোহ, নিখুঁত পর্যবেক্ষণ, তার মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে নেপথ্য অর্থনৈতিক 'কার্য-কারণ'-এর ছবিটিও। আরও যেটা বলার কথা—স্বাধীনতার প্রায় সাতটি দশক পেরিয়ে আসার পরে ভারতে আজও পূর্ব-বর্ণিত উপসর্গগুলির, সবটা না হলেও অনেকটাই বিদ্যমান, তা আমাদের চোখে পড়ে না কি? যাইহোক, গান্ধীজির দেখা পূর্ব-বর্ণিত লক্ষণগুলিকে মোটামুটি চিহ্নিত করা যায় এইভাবে :

(১) তিনি বুঝেছিলেন, একটি অতি-দরিদ্র ঔপনিবেশিক দেশে, যেখানে মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ মানুষ শহরবাসী, সেখানে দ্রুত নগরায়ণের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাছাড়া, সাম্রাজ্যবাদী শাসক বা রাষ্ট্র তার উপনিবেশে নগরায়ণের প্রসার ঘটাবেই বা কোন স্বার্থে?

(২) সেখানে তিনি বলেছেন, '...শহরবাসীরা যে সম্পদ নির্দয়ভাবে...' ইত্যাদি, তার সঙ্গে আধুনিক বিশ্বের তথাকথিত 'উন্নয়ন' বনাম 'উচ্ছেদ'-এর কথা সততই মনে পড়ে যায়।

(৩) উচ্ছেদ-অবিচার-বঞ্চনার শিকার সিংহভাগ মানুষদের সামাজিক অবস্থান এই একশো বছরেও প্রায় অপরিবর্তিতই রয়েছে বলা যায়।

(৪) সংশ্লিষ্ট বিপন্ন মানুষদের সাহায্য করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা-সহ যে ধরনের সংস্থা গঠনের কথা তিনি বলেছেন, তার সঙ্গে দেশজুড়ে কর্মরত এই সময়ের শয়ে শয়ে অ-সরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যেন রয়েছে আশ্চর্য সাদৃশ্য।

পূর্বোক্ত পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরে সেই সময়ের দেশের কৃষকের দুরবস্থা ও কৃষির সংকট নিয়ে গান্ধীজি যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে বর্তমানের 'কৃষি সংকট'-এর (অবশ্য বর্তমান সংকটের কারণ-বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

ভিন্নতর) ফুটে ওঠা লক্ষণগুলিও বহুলাংশেই মিলে যায়। তিনি বলেছিলেন, "কিন্তু (বিপন্ন গ্রামীণ শিল্পী সম্প্রদায় ছাড়াও) অন্যান্য গ্রামবাসীর অবস্থাও আজকাল বিশেষ ভালো নয়। ক্রমে ক্রমে তারা কেবল কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে যাচ্ছেন। তাতে কায়ক্লেশে জীবিকা অর্জন করতে হয়। অল্প লোকেই একথা জানেন যে, ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জমিতে কৃষিকার্য মোটেই লাভজনক নয়। গ্রামবাসীরা নির্জীবের মতো বেঁচে আছে।...তারা ঋণে ডুবে আছেন। ...গ্রামের ঋণপদ্ধতি কীরূপ তদন্ত করে তা সম্যক জানা যায় না। খুবই তোড়জোড় করলেও সে সম্পর্কে আমরা ভাঙা ভাঙা রকমের কিছু জানতে পারি মাত্র।"

তাহলে, মোটের উপর, ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? অতীত ও বর্তমান-সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটির দিকে তাকিয়ে কি বলা যায়—সেই পরম্পরা আজও চলেছে। অথবা, এও তো বলা যেতে পারে, আজ থেকে একশো বছর আগে ভারতের কৃষি ও কৃষককে যে চোখে গান্ধীজি দেখেছিলেন ও চিনেছিলেন, আধুনিক অর্থনীতিবিদ বা কৃষি-বিশেষজ্ঞের পর্যবেক্ষণও প্রায় সে রকমই! আজও তো ভারতীয় অর্থনীতির যে কোনও বইয়ে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে চোখ বোলালে অন্যান্য অনেক কারণের মধ্যে এগুলিও জ্বলজ্বল করছে: (১) কৃষিতে ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও ছদ্ম বেকারত্ব, (২) জমির ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র খণ্ড-বিভাজন, (৩) ক্রমবর্ধমান ঋণের চাপ ও মহাজনি-ঋণ।

এইভাবে, অনেক সময়েই মহাত্মা গান্ধীকে একজন দূরদ্রষ্টা সার্থক অর্থনীতিবিদ হিসাবেও আবিষ্কার করতে ও চিনে নিতেও অসুবিধা হয় না।

গান্ধী-ভাবনা এবং বর্তমান ভারত

মহাত্মা গান্ধীর বর্ণময় রাজনৈতিক জীবনে 'খাদি' ও 'চরকা' একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ স্থান করে নিয়েছিল। মূলত বিদেশি উপকরণে তৈরি ও 'মিলে'-র বা যন্ত্র মাধ্যমে তৈরি কাপড় ও পরিধেয় অনুষঙ্গ বর্জন করে, দেশের মানুষের নিজে হাতে তৈরি প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি তৈরি ও ব্যবহার করার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। এই খাদি ও চরকার আন্দোলনকে তিনি বারে বারে 'স্বদেশি' নাম-পরিচয়ে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন সারা দেশ জুড়ে। এই খাদি ও চরকার আন্দোলন শুরু করতে গিয়ে তাঁকে যে অজস্র খুঁটিনাটি সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ রয়েছে তাঁর আত্মচরিতে। আসলে, তাঁর প্রবর্তিত এই যে 'খাদি' ও 'চরকা'— তা নিছকই দেশজ হস্তশিল্পকে উজ্জীবনের উদ্দেশ্যমূলক ছিল না, বরং তা তাঁর স্বদেশি সংগ্রামের সমার্থক হয়ে উঠেছিল। এক কথায় বলা যায়, খাদির প্রতীকী তাৎপর্যের মধ্য দিয়ে দেশ জুড়ে এক সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দেশপ্রেমের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। পাশাপাশি, সেই সময়ে পরাধীন দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও, খাদি ও চরকার মাধ্যমে এক ধরনের স্বয়ম্ভরতার তাগিদও তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, দেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে চরকা বা খাদির আন্দোলন কতখানি সফল বা সার্থক হয়েছিল, সেটা ভিন্ন প্রশ্ন, যা বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্যও নয়। তবে, গান্ধীজির নেতৃত্বাধীন এই আন্দোলনে সেই আমলের অবিভক্ত বাংলা যে প্রবলভাবে শামিল হয়েছিল, তার লিখিত প্রমাণ রয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস গ্রন্থে খাদি ও চরকাকে ঘিরে সেই সময়কার বাংলা ও বাঙালির এই যে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামী মানসিকতা, তার সপ্রশংস স্বীকৃতি রয়েছে গান্ধীজির আত্মচরিতে। গান্ধীজির আত্মজীবনীতে 'অ্যান ইনস্ট্রাকটিভ ডায়লগ' শীর্ষক একটি কথোপকথনমূলক (উমর সোবানি নামের এক বস্ত্র-মিল-মালিকের সঙ্গে) অধ্যায়ে সাধারণভাবে 'খাদি' ও বিশেষভাবে তৎকালীন গান্ধী অনুরাগী বাঙালিদের খাদিকেন্দ্রিক ও মিল-বিরোধী মানসিকতার বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। ওই অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট অংশবিশেষ ছিল মোটামুটি এই রকম (বঙ্গানুবাদে)—

মিল-মালিকের উক্তি : আমরা কোনও দান-খয়রাতি করার জন্য ব্যবসা করতে আসিনি। আমরা ব্যবসা করি লাভের জন্য। কোনও জিনিসের দাম নির্ধারিত হয় তার চাহিদার ভিত্তিতে। চাহিদা-জোগানের নিয়মকে কে অস্বীকার করবে? তাই, বাঙালিদের জেনে রাখা উচিত যে, তাদের আগ্রাসী স্বদেশি আন্দোলনের জন্য সেখানে স্বদেশি কাপড়ের চাহিদা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে, তার ফলে এসবের দামও কিন্তু হুহু করে বাড়বে।

গান্ধীজির উত্তর : "বাঙালিরা, আমার মতোই, স্বভাবে বিশ্বাসপ্রবণ। তারা তাদের বিশ্বাসে অটল থাকে এবং তারা এও জানে, জরুরি মুহূর্তে মিল মালিকেরাও নিশ্চিতভাবেই স্বার্থপর হয়ে উঠবে না ও দেশ-বিরোধী কাজ করবে না এবং নিশ্চয়ই বিদেশি কাপড়কে স্বদেশি বলে চালান করবে না।..."

এই কথোপকথনের পরেও মিল-মালিক ব্যবসায়ী উমর সোবানির সঙ্গে গান্ধীজির আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। এক সময়ে দু'জনেই সহমত হয়েছিলেন এই ব্যাপারে যে, দেশজোড়া খাদির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এ জাতীয় বস্ত্রাদির উৎপাদন অনেকটাই বাড়াতে হবে যেমনভাবেই হোক। এই হল গান্ধীজির 'চরকা-ভাবনা'-র উৎস-কথা, যা শুনে সেই মুহূর্তে মুগ্ধ হয়েছিলেন মিল-মালিক সোবানি। এরপর গান্ধীজি তাঁর কাছে স্বদেশি-সহায়ক 'চরকা আন্দোলন'-এর যে বহুমুখী জনকল্যাণকর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা ছিল মোটামুটি এই রকম : "আমার তরফে নতুন নতুন কাপড়-কল তৈরির প্রচারক বা 'এজেন্ট' হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়—তাতে দেশের ভালোর চেয়ে ক্ষতিই করা হবে বেশি। তাই আমার কাজ হবে—হাতে বোনা কাপড় তৈরিকে ব্যাপকভাবে উৎসাহ দেওয়া এবং এইভাবে তৈরি কাপড়কে (খাদি) ঠিকঠাক বাজারে জোগান দেওয়া। নতুন ধাঁচের এই স্বদেশির নামে আমি শপথ নিয়েছি—এই ব্যবস্থায় আমি ভারতের অর্ধ-ভুক্ত, প্রায়-বেকার দুঃস্থ মহিলাদের কাজ দিতে পারব। আমার পরিকল্পনা হল—এই সব মেয়েরা হাত-চরকায় সুতো বুনে কাপড় তৈরি করবে এবং তাদের তৈরি এই সব 'খাদি' পোশাক ভারতের মানুষেরা ব্যবহার করবে।...এইভাবে দেশের মোট বস্ত্র-উৎপাদনের পরিমাণও বাড়বে; এক্ষেত্রে সামগ্রিক ও নৈতিকভাবে আমরা যথেষ্ট লাভবান হব।"

এই হল গান্ধীজির চরকা তথা খাদির আদর্শগত ভিত্তি ও রূপরেখা যেখানে স্বদেশি বা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে অনায়াসে

মিলেমিশে রয়েছে এক ধরনের স্বয়ম্ভরতা উদ্দেশ্য, দক্ষতার পুনরুজ্জীবন, মহিলা-ক্ষমতায়নের মতো নানাবিধ আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যমুখিতা। গান্ধীজির এই 'খাদি-আন্দোলন' ঠিক কতদূর ও কতখানি সাফল্য-লাভ করেছিল, তা ইতিহাসবিদদের চর্চার বিষয়, কিন্তু, সেই আমলের ভারতবাসীদের এক উল্লেখযোগ্য অংশে যে খাদি ও চরকা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল, নাতিদূর অতীত ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য-প্রমাণ রয়েছে। আর, তাঁর এই আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তিটি যে প্রকৃতই যথেষ্ট মজবুত ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে—তাঁর মৃত্যুর প্রায় সাত দশক পরের ভারতেও যে ভারতের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক পুরো চেহারাটাই এই সময়ের মধ্যে প্রায় আমূল বদলে গিয়েছে। আজও সম্ভবত ভারতের এমন কোনও রাজ্য বা অঞ্চল নেই, যেখানে খাদি বা হস্তশিল্পজাত বস্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র পাওয়া যায় না।

এই সূত্রে আবারও উল্লেখ করতে হয় (পূর্বোক্ত কথোপকথনে যার সামান্য ছোঁয়া আছে) তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার নাম, যেখানে খাদি আন্দোলন ঘিরে মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহ। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, বাংলার নারীদের মধ্যে তা ছাত্রী বা যুবতী হোক অথবা মধ্য-বয়স্কা বা প্রৌঢ়া, সাধারণভাবে, গান্ধী-প্রভাব ও বিশেষভাবে খাদি আন্দোলন উল্লেখযোগ্যভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ক্ষেত্রে শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই নয়, বাংলার অসংখ্য দুঃস্থ, অসহায় নারীর আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনেরও ক্ষেত্রেও গান্ধী-প্রভাব খুবই কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল।

বাংলার নারীদের মধ্যে গান্ধীজি-প্রভাবের অতি সামান্য নমুনা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রেও আবার দুটি ভাগ করা যায়। প্রথমভাগে রয়েছেন সেই সব মহিলা, যাঁরা গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন। আর, দ্বিতীয়ভাগে রয়েছেন অসংখ্য নেপথ্যে থাকা সেই সব নারী, যাঁরা মনে-প্রাণে গান্ধীজির আদর্শে দীক্ষিত হয়ে দেশসেবার নানা কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আবার, দ্বিতীয় পর্যায়ের নারীদের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন, গান্ধীজি-নির্দেশিত পথে যাঁদের সামাজিক পুনর্বাসন ঘটেছিল এবং সুস্থ, মর্যাদাপূর্ণ নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন—যাকে আধুনিক পরিভাষায় বলা যেতে পারে নারীর ক্ষমতায়ন।

এইভাবে, অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল গান্ধীজির 'সর্বোদয়' - আদর্শ-অনুপ্রাণিত 'অভয় আশ্রম'। অভয় আশ্রমগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল—নারী-পুরুষ নির্বিশেষে স্বনির্ভতা উদ্যোগ, মূলত হস্ত ও কুঠির শিল্প-সহ স্বদেশি শিল্প গঠন ও বিকাশ, দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন, সুযোগ-বঞ্চিত নারীদের শিক্ষা-দান-সহ বিভিন্ন স্তরের বুনিয়াদি শিক্ষা-প্রসার ইত্যাদি। সাক্ষরতা-শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে সংযোজিত হয়েছিল গান্ধীজি উদ্ভাবিত 'নঈ তালিম' নামে নতুন ধরনের শিক্ষা-পদ্ধতি।

আজ থেকে ৭০-৮০ বছর, কি তারও আগে থেকে সারা দেশে গান্ধীজি প্রদর্শিত পথে পূর্ব-বর্ণিত যে বহুমুখী কর্মযজ্ঞ চলছিল, তারই সূত্র ধরে কিন্তু অনায়াসে চলে আসা যায় আধুনিকতম ভারতের পটভূমিতে। এর আগেই আমরা দেখেছি—আধুনিক ভারতের কৃষি ইত্যাদির ক্ষেত্রে গান্ধীজির অর্থনৈতিক ধারণা ও বিশ্লেষণের কম-বেশি ছায়াপাত আজও রয়ে গিয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রীয় আর্থ-সামাজিক উদ্যোগেও, যেমন মহাত্মা গান্ধী রোজগার যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, প্রধানমন্ত্রী জন-ধন যোজনা এবং আরও অসংখ্য ছোট-বড় প্রকল্পের সঙ্গে গান্ধীজির আদর্শ ও স্বপ্ন যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে. এমনকী, সাম্প্রতিকতম ভারতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত যে 'স্কিল ইন্ডিয়া' বা 'দক্ষ ভারত' প্রকল্প, সেখানেও গান্ধীজির ইতিবাচক আদর্শগত প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষণীয়। গান্ধীজির 'ক্রাফ্‌ট' নামে যে বিষয়টির উপর জোর দিতেন, সেটাই যে আজকের ভাষায় দক্ষতা বা 'স্কিল' (তা হস্ত বা কুটির শিল্প অথবা কারিগরি বা যান্ত্রিক শিল্প, যাই হোক না কেন)—একথা সম্ভবত বলার অপেক্ষা রাখে না।

যাই হোক, বর্তমান ভারতের সদ্য-ঘোষিত 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র ধারণাটি ঠিক কী রকম—প্রথমেই তা দেখা যাক এবং তার পরে গান্ধীজির প্রাসঙ্গিক অভিমতকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞদের অভিমতে, এক কথায় 'স্কিল ইন্ডিয়া' হল এমন এক পরিব্যাপ্ত প্রকল্প, যা দেশকে 'সর্বাত্মক বৃদ্ধি' থেকে 'সর্বাত্মক উন্নয়ন'-এর বিন্দুতে পৌঁছে দেবে। স্কিল ইন্ডিয়া-প্রকল্প নব-গঠিত 'দক্ষতা ও উদ্যোগ' বিভাগের ছত্রচ্ছায়ায়, এত দিনের চালু থাকা বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে দক্ষতা-সংস্কারে রূপান্তরিত করবে, যার মূল উদ্দেশ্য হবে কর্মসংস্থান-সুযোগ-উন্নয়ন ও অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি। উন্নততর দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সমস্ত চাকরি প্রার্থীর কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত থাকবে—বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা থাকবে গ্রাম থেকে আসা যুবক-যুবতীদের জন্য। এইভাবে, সর্বস্তরের আগ্রহীদের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে স্কুলছুট থেকে শুরু করে চাকরিহীন উচ্চশিক্ষিত—সকলের জন্যই প্রকৃত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রসঙ্গে, ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ মিরিয়াম কার্টার (ডিরেক্টর, ও পি জিন্দল কমিউনিটি কলেজ) মন্তব্য করেছেন, "Skilling India is an imperative for a strong prosperous nation where inclusive growth is a reality for all sectors of the society." অর্থাৎ ভারতের 'দক্ষতাকরণ' একান্ত প্রয়োজনীয়, কারণ ভারত এখন একটি মজবুত, সমৃদ্ধ দেশ, যেখানে সমাজের সব স্তরের মানুষের সর্বাত্মক বৃদ্ধি একটি বাস্তব ঘটনা।

গান্ধীজি তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বর্তমান-আলোচ্য বিষয়টি নিয়ে বহুবার নানাভাবে তাঁর অভিমত ও প্রস্তাব দিয়েছেন। সেসবের মধ্যে থেকে মাত্র দুটি বক্তব্য এখানে তুলে ধরা হচ্ছে—সেগুলি বর্তমানের 'স্কিল ইন্ডিয়া'-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা পরিপূরক। ১৯৩৭ সালে ওয়ার্ধা সম্মেলনে তাঁর বক্তৃতায় মহাত্মা গান্ধী দক্ষতা, স্বয়ম্ভরতা ও স্বরাজ বা স্বাধীনতার মধ্যে পারস্পরিক নিবিড় ও ওতপ্রোত সম্পর্কের বিষয়টি নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাবনায় চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং দেশবাসীকে এই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। কতটা প্রাজ্ঞ দূরদর্শিতা থাকলে এই তিনটি ভিন্ন ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক বিষয়ের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি সুসংহত ও জরুরি দিগ্‌নির্দেশ করা সম্ভব—তা সহজেই অনুমেয়। আবার,

আশ্চর্যজনকভাবে, তাঁর বক্তব্যের মর্মবস্তুর সঙ্গে আধুনিক অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিকদের প্রাসঙ্গিক তাত্ত্বিকতাও প্রায় হুবহু মিলে যায়; যে আধুনিক সংশ্লিষ্ট তত্ত্বে বলা হয়েছে পূর্বোক্ত গান্ধীজি নির্দেশিত সমন্বয়বাদী পথ ধরে দক্ষ মানবসম্পদ, আর্থিক বৃদ্ধি ও সামাজিক গতিশীলতার মধ্যেও একটি কার্যকরী, নির্দিষ্ট পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব।

এই প্রসঙ্গে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটির স্থান-কাল—দিল্লির 'বিড়লা হাউস', ১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর। সেখানে একদল ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতার মাঝে গান্ধীজি মন্তব্য করেন, "Only through imparting education through crafts can India stand before the world." অর্থাৎ, একমাত্র 'দক্ষতা'-র মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে বিশ্ব-আঙিনায় ভারত যথোপযুক্ত জায়গা করে নিতে সক্ষম হবে। এখানে লক্ষণীয় যে এই মন্তব্য গান্ধীজি করেছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন ভারত সদ্য-স্বাধীন হয়েছে। এর অর্থ ঔপনিবেশিক ভারতের 'গুণগত' পরিবর্তন ঘটে স্বাধীন, সার্বভৌম দেশে রূপান্তরিত হয়েছে. স্বাধীন দেশের মানুষের চোখে তখন অনেক স্বপ্ন, হাজারো প্রত্যাশা। দুঃখের হলেও এটা তো অনস্বীকার্য যে, গান্ধীজির সেদিনের পরামর্শকে সুনির্দিষ্টভাবে গ্রহণ ও রূপায়িত করতে ইতিমধ্যে প্রায় সাতটি দশক অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। যাই হোক, দেরিতে হলেও, গান্ধীজির সেই দূরদর্শিতার যে বাস্তব রূপায়ণ ঘটতে চলেছে 'স্কিল ইন্ডিয়া' প্রকল্পের মাধ্যমে—সেটাও নিঃসন্দেহে এক আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ।

এই কারণেই সম্ভবত সমাজ বিশেষজ্ঞ অনিল প্রসাদ আক্ষেপের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, "Now in 21st century, when we talk about the gap between what industry demands and what our education system provides, and the need for skill training, I seldom hear people mentioning the revolutionary and futuristic vision of Mahatma Gandhi. If we would have heard his words, with the right script and acted timely and properly, the story would have been entirely different now." শ্রী প্রসাদের এই মন্তব্যের যথার্থতা অকাট্য। একথা কে অস্বীকার করতে পারে—শুধু দক্ষতা-সংক্রান্ত গান্ধীজির প্রস্তাব নয়, স্বাধীন ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির পটভূমিতে গান্ধীজির আরও নানা যুক্তি-পরামর্শ ও প্রস্তাবে যদি কার্যকরী গুরুত্ব দেওয়া হত, তাহলে আজ হয়তো এক ভিন্নতর, উজ্জ্বলতর ভারতকে দেখা যেত।

আদর্শবাদ বনাম আধুনিক তাত্ত্বিকতা

গান্ধীজি নিজেকে কোনওদিন 'অর্থনীতিবিদ' হিসাবে ঘোষণাও করেননি, বা 'অর্থনীতি'-কে স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে ভাবতেও তাঁর কোনও আগ্রহও ছিল না। কিন্তু, তথাকথিত আধুনিক অর্থনীতিবিদরা তাঁকে বারে বারে, মূলধারার অর্থনীতির পাশে দাঁড় করিয়ে তুলনামূলক বিচার করতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ বিচারে, এই সব অর্থনীতিবিদরা তাঁর গায়ে কোনও চলতি অর্থনীতির তকমা সাঁটিয়ে দিতে পারেননি। তাঁদের অভিমতে, গান্ধীজি না ছিলেন বাণিজ্যিক অর্থনীতিবিদ, না ছিলেন ধ্রুপদী বা নয়া-ধ্রুপদী ঘরানার। যেমন রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক ভাবনা-চিন্তাকে কোনও প্রথাগত তাত্ত্বিকতার ছকে ফেলা যায়নি, গান্ধীজির বেলাতেও ঘটেছে সেই একই ঘটনা। আসলে, এই সব আধুনিক পণ্ডিতেরা একবারও ভেবে দেখেন না—মহাত্মা গান্ধীর মতো শিখর-স্পর্শী, অনন্য মনীষীদের ভাবনাচিন্তায় যে বহুমুখী মহৎ দার্শনিক-মননের সম্মিলন ঘটে থাকে, সেখানে পৃথকভাবে অর্থনীতি-ইতিহাস-সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বিষয় শনাক্ত করার প্রয়াস নিতান্তই অর্থহীন ও অবান্তর।

অনেক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজতাত্ত্বিক গান্ধীজির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন অতীব মূল্যবান আর্থ-সামাজিক ভাবনার মৌলিকতা। 'A History of Economic Thought' গ্রন্থের লেখক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অজিত দাশগুপ্ত তাই সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন, "...the structure of his (Gandhiji's) arguments, the assumptions he made, and the principles of conduct that he appeared to, must be regarded as of central importance. It is these, we believe, that make his specific policy proposals comprehensible, not the other way round." অর্থাৎ, গান্ধীজির অর্থনীতি ভাবনাকে দেখতে হবে তাঁর নিজস্ব যুক্তি-ধ্যানধারণা-নীতিবোধের মধ্যে থেকেই এবং সেটার কেন্দ্রীয় গুরুত্বও অতীব মূল্যবান এবং এইভাবে দেখা যায়—গান্ধীজির সুনির্দিষ্ট নীতি-প্রস্তাবগুলি যথাযথভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।

শেষকথা

তাই, এক কথায় বলা যায়—বর্তমান ভারতের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আজও গান্ধীজির যথেষ্ট প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। আগামী দিনের সুদক্ষ, সমৃদ্ধতর ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, 'গান্ধীজির দর্শন' অবশ্যই এক অপরিহার্য ও বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।❑

[লেখক অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ের প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার]

উল্লেখপঞ্জী :

১। An Autobiography–M. K. Gandhi.

২। Gandhi News—Gandhi Museum, Jan-March, 2012.

৩। পশ্চিমবঙ্গ (গ্রামোন্নয়ন বিশেষ সংখ্যা)—মার্চ, ২০০৩।

৪। A Hisotry of Economic Thought—Ajit Dasgupta.

কারিগরিবিদ্যা ও শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনার উদ্ধৃতাংশ

প্যারেলালের লেখা 'সমালোচনার মুখে ওয়ার্ধা প্রকল্প' (ওয়ার্ধা স্কিম আন্ডার ফায়ার) শীর্ষক নিবন্ধ থেকে প্রশিক্ষণ নিতে আসা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে গান্ধীজির আলোচনার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল। ওয়ার্ধার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিন সপ্তাহ ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে সারাদেশ থেকে প্রায় পঁচাত্তর জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর যে যার প্রদেশে ফিরে যাওয়ার আগে অংশগ্রহণকারীরা গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

প্রশ্ন—বৈঠকে যাওয়ার আগে এক বন্ধু গান্ধীজিকে জিগ্যেস করেছিলেন যে 'তকলি'র সঙ্গে খাপ খায় না এমন কথা ছাত্র-ছাত্রীদের বলা যাবে না এটাই কি ওয়ার্ধা প্রকল্পের মূল কথা? সবার সঙ্গে বৈঠকের সময় গান্ধীজি এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

গান্ধীজি—এটা কিন্তু আমার সম্বন্ধে অপপ্রচার। আমি এটা অবশ্যই বলেছি যে পাঠদানের পদ্ধতির সঙ্গে যেন কিছু মৌলিক কারিগরিবিদ্যার যোগ থাকে। এটা আমি কখনওই অস্বীকার করি না। আপনারা যখন সাত বা দশ বছর বয়সি বাচ্চাদের কোনও শিল্পকে মাধ্যম করে শিক্ষা দেবেন, তখন গোড়াতেই আপনাদের সেই সমস্ত বিষয়কে বাদ দিয়ে দিতে হবে যেগুলির সঙ্গে কারিগরিবিদ্যার কোনও যোগসূত্র নেই। এই কাজটা যদি দিনের পর দিন জারি রাখতে পারেন তাহলে গোড়ায় যে বিষয়গুলিকে বাদ দিয়েছিলেন তার সঙ্গে কারিগরিবিদ্যাকে মেলানোর পথ নিজেরাই খুঁজে বের করতে পারবেন। তাই গোড়াতেই যদি এই বাদ দেওয়ার কাজটা শুরু করেন তাহলে আপনাদের নিজেদের এবং ছাত্রছাত্রীদের দু'পক্ষেরই পরিশ্রম বাঁচবে। বর্তমানে এ সম্পর্কে কোনও বই নেই, অনুসরণ করার মতো কোনও দৃষ্টান্তও নেই। তাই আমাদের একটু ধীরে চলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মনে প্রাণে সজীব থাকতে হবে। এটাই কিন্তু আসল কথা। ধরুন আপনি কোনও একটা বিষয় জানতে পারলেন, কিন্তু কীভাবে তাকে হাতে-কলমে প্রয়োগ করবেন তা বুঝতে পারলেন না। আমি বলি তাতে হতাশ হবেন না, ভেঙে পড়বেন না। আপনি এমন কোনও বিষয় নিয়ে ভাবুন যা হাতে-কলমে প্রয়োগ করা যাবে। হয়তো অন্য কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা ওই বিষয়টিকে হাতে-কলমে প্রয়োগ করার কোনও সঠিক পথ খুঁজে বের করতে পারেন। সকলের অভিজ্ঞতা একসঙ্গে জমা হলে, আপনাদের পথ দেখানোর জন্য অনেক বই রচিত হতে পারে। এর ফলে আপনাদের পথ যাঁরা অনুসরণ করবেন তাঁদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

. . . . .

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন ঘটাতেই হবে। হাত যা করবে মাথা যেন তা থেকেই শিক্ষা পায়। আমি যদি কবি হতাম তাহলে পাঁচ আঙুলের অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে একটা কবিতাই লিখে ফেলতাম। কেন আপনারা মনে করেন যে মস্তিষ্কই আসলে সব! আর হাত-পায়ের কোনও ভূমিকাই নেই! যারা নিজেদের হাতকে ভালোভাবে তৈরি না করে শুধু পুঁথির পড়া পড়ে জীবন কাটিয়ে দেয় তারা কিন্তু জীবনের মূল 'সুর' থেকেই বঞ্চিত রয়ে যায়। তাদের দক্ষতার পরিপূর্ণ বিকাশ হয় না। শুধু পুঁথিগতবিদ্যা শিশুর মনে দাগ কাটতে পারে না। তাই এই পুঁথি পড়ায় শিশুরা পুরোপুরি মনোযোগও দিতে পারে না। ভারি ভারি শব্দের কচকচিতে শিশুরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তাদের মন বিভ্রান্ত হয়। যে কাজ করা উচিত নয় তাদের হাত সেই কাজই করে, তাদের যা দেখা উচিত নয় তাদের চোখ সেই দৃশ্যই দেখে, যা শোনা উচিত নয় তাদের কান সেই শব্দই শোনে এবং তাদের যা করা, দেখা বা শোনা উচিত তারা তা কোনওটাই করে না। কারণ কোনটা সঠিক সেই শিক্ষা তাদের দেওয়া হয়নি। তাই তাদের শিক্ষাই প্রায়শই তাদের বিপদগামী করে তোলে। শিক্ষা যদি ঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য করতে না শেখায়, বা ভালোটাকে গ্রহণ করে মন্দটাকে বর্জন করতে না শেখায় তবে সে শিক্ষা অর্থহীন।

প্রশ্ন—হাতের মাধ্যমে কীভাবে মনের শিক্ষা সম্ভব এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য এরপর গান্ধীজিকে অনুরোধ করেন আশা দেবী।

গান্ধীজি—বিদ্যালয়ে সাধারণ পাঠ্যসূচির পাশে হস্তশিল্পকেও রাখার একটা গতানুগতিক ধারণা চলে আসছে। অর্থাৎ সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে কারিগরিবিদ্যাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে রাখা হচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি এর মতো মারাত্মক ভুল আর হয় না। শিক্ষক-শিক্ষিকাকে অবশ্যই কারিগরিবিদ্যা আয়ত্ত করতে হবে এবং তাঁর জ্ঞানের সঙ্গে এই কারিগরিবিদ্যার একটা মেলবন্ধন ঘটাতে হবে যাতে তিনি ছাত্রছাত্রীদের তাঁর পছন্দসই কারিগরিবিদ্যার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের শিক্ষা দিতে পারেন।

এই সুতো বোনার উদাহরণই ধরুন। আমার পাটিগণিতের জ্ঞান যদি না থাকত তাহলে আমি কি বুঝতে পারতাম 'তকলি'তে কত গজ সুতো রয়েছে, বা আরও কতবার এটা আমায় ঘোরাতে হবে কিংবা আমার বোনা সুতোর মাপ কত। ('তকলি' এক ধরনের হস্তচালিত সুতো বোনার যন্ত্র।) এই কাজগুলো করার জন্য আমার সংখ্যার জ্ঞান থাকতে হবে—আমাকে অবশ্যই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ শিখতে হবে। আরও জটিল অঙ্কের ক্ষেত্রে আমাকে অনেক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে, বীজগণিত শিখতে হবে। এমনকী এ ক্ষেত্রেও আমিও রোমান নয়, বরং ভারতীয় হরফ ব্যবহারের পক্ষপাতী।

এবার জ্যামিতির কথাই ধরুন। 'তকলি'র এই চাকতিটার চেয়ে বৃত্তের অন্য কোন ভালো উদাহরণ কি হতে পারে? ইউক্লিডের নাম উচ্চারণ না করেও আমি এভাবেই সকলকে শিখিয়ে দিতে পারব বৃত্ত কাকে বলে।

এবার আপনারা হয়তো জিগ্যেস করবেন সুতো কেটে আমি বাচ্চাদের কীভাবে ইতিহাস, ভূগোলের শিক্ষা দেব? কিছুদিন আগে একটা বই পড়েছিলাম। বইটির নাম 'কটন দ্য স্টোরি অফ ম্যানকাইন্ড'। বইটি পড়ে অভিভূত হয়েছিলাম। সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। সেই প্রাচীন যুগে যখন তুলো চাষ শুরু হয়েছিল সেই সময়ের বৃত্তান্ত দিয়ে বইটি শুরু হয়েছে। তার পরে একে একে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়, বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুলোর বাণিজ্য সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই বইতে।

বাচ্চাদের আমি যখন নানান দেশের নাম বলি, তখন তো খুব স্বাভাবিকভাবে ওই সব দেশের ইতিহাস ভূগোলের কিছু প্রাসঙ্গিক কথা এসেই পড়ে। বিভিন্ন যুগে কোন শাসকের রাজত্বকালে বাণিজ্যিক চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? কোনও কোনও দেশকে কেন অন্য দেশ থেকে তুলো বা বস্ত্র আমদানি করতে হয়? সব দেশই বা কেন নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী তুলোর চাষ করে নিতে পারে না? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অর্থনীতি এবং কৃষিবিদ্যার মৌলিক ব্যাপার-স্যাপারগুলো নিয়েও আলোচনা করতে হয়। আমাকে তাদের বোঝাতে হয় যে তুলোর নানান প্রকারভেদ রয়েছে। এক এক রকম মাটিতে এক এক ধরনের তুলোর চাষ সম্ভব। কীভাবে তুলোর চাষ করতে হয়, এবং কোথায় তা করতে হয়.....এ সবই আমাকে বাচ্চাদের শেখাতে হয়। এইভাবে চরকায় সুতো কাটতে গিয়ে আমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুরো ইতিহাস জানতে পেরেছি। আমি জানতে পেরেছি কেন তারা এ দেশে ঘাঁটি গেড়েছিল, কীভাবে তারা আমাদের দেশের তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করেছিল। আমি এও জেনেছি যে কীভাবে বণিকের বেশে এসে তারা এ দেশের শাসক হয়ে বসেছিল, কীভাবে তারা মোগল ও মারাঠা সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ব্রিটিশরাজ কায়েম করেছিল। তার পরে আমাদের সময়ে এদের কারণেই কিন্তু চারদিকে এত জনজাগরণ ঘটছে। তাই শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নতুন প্রকল্পের অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। মন ও মস্তিষ্কের ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি না করে শিশুরা কত তাড়াতাড়ি শিখতে পারে সেটাই আসলে দেখার।

ব্যাপারটা আরেকটু খুলে বলি। একজন ভালো জীববিজ্ঞানী হওয়ার জন্য জীববিদ্যা ছাড়াও একজন ব্যক্তিকে অন্যান্য বিজ্ঞানও রপ্ত করতে হয়, ঠিক তেমনিভাবেই বুনিয়াদি শিক্ষাকে যদি বিজ্ঞানের মতো করে ভাবা যায় তাহলে আমাদের সামনে শিক্ষালাভের শতশত পথ খুলে যাবে। এবার আবার 'তকলি'র প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

একজন শিক্ষক তো 'তকলি' চালানো অবশ্যই রপ্ত করতে হবে। কিন্তু তিনি যদি সুতো বোনার যান্ত্রিক প্রক্রিয়াটার ওপরই নিজের যাবতীয় মনোযোগ আবদ্ধ না রেখে বিষয়টার আরও গভীরে ঢোকেন তাহলে এই 'তকলি'র সম্বন্ধে কত অজানা তথ্য জানতে পারবেন! তিনি তো নিজেকে প্রশ্ন করতে পারেন এই 'তকলি' কেন একটা পেতলের চাকতি আর ইস্পাতের একটা ঘূর্ণায়মান দণ্ড দিয়ে তৈরি হবে? প্রথম প্রথম যেকোনওভাবে একটা চাকতি বানিয়ে তকলিতে জুড়ে দেওয়া হত। আরও প্রাচীন কালে তকলিতে লোহার বদলে কাঠের দণ্ড ব্যবহার করা হত। আর চাকতিটা ছিল স্লেট পাথরের বা মাটির। তারপর ধীরে ধীরে একেবারে বিজ্ঞানসম্মতভাবে 'তকলি'র উন্নতিসাধন হয়েছে। মাটির বদলে এসেছে পেতলের চাকতি। আর কাঠের জায়গায় এসেছে লোহার দণ্ড। একজন শিক্ষককে এই পরিবর্তনের কারণটা খুঁজে বের করতে হবে। তাকে মনে মনে ভাবতে হবে এই চাকতিটার একটা নির্দিষ্ট ব্যাস থাকার কারণ কী? কেন তার বেশি বা কম হয় না? তিনি যদি সন্তোষজনকভাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলি খুঁজে বের করতে পারেন এবং গণিতশাস্ত্রের গভীরে ঢুকতে পারেন তাহলে তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা অবশ্যই ভালো প্রযুক্তিবিদ তৈরি হবে। তখন দেখা যাবে যে এই 'তকলি'ই তাঁর কাছে 'কামধেনু'র মতো এক আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কী অপরিসীম সম্ভাবনা রয়েছে তা ভেবে অবাক হতে হয়! শুধুমাত্র আপনাদের উৎসাহ ও বিশ্বাসের অভাবে এর সম্ভাবনা সীমিত হতে পারে। আপনারা তিন সপ্তাহ ধরে এখানে রয়েছেন। এই প্রকল্পের শিক্ষাকে যদি আপনারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনারা একে কার্যকরভাবে কাজে লাগাবেন। তখন আপনারা নিজের মনেই সংকল্প করবেন—'করব অথবা মরব'।

আমি এখানে সুতো বোনার দৃষ্টান্ত দিলাম কারণ আমি এই কাজটা জানি। আমি যদি ছুতোর বা কাঠের মিস্ত্রি হতাম তাহলে আমি বাচ্চাদের কাঠের কাজের বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে এই একই শিক্ষা দিতাম। কিংবা কার্ড বোর্ডের কারখানার শ্রমিক হতাম তাহলে এই শিক্ষা কার্ডবোর্ডের বিভিন্ন কাজের সাহায্যে দিতাম।

আমরা এখন শিক্ষাবিদদের মধ্যে মৌলিক চিন্তাধারা, এক নতুন উদ্দীপনা দেখতে চাই। তিনি যেন গতানুগতিক পথের বাইরে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দিতে পারেন। শুধু মোটা মোটা বই পড়ে এই শিক্ষা তিনি পাবেন না। তাঁকে তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা ও তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে মুখে মুখে এবং হাতে-কলমে ছাত্রছাত্রীদের শেখাতে হবে। তার মানে শুধু শিক্ষা ব্যবস্থাতেই নয়, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও আমূল পরিবর্তন আনতে হবে.....

প্রশ্ন—শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথমে শিক্ষকদের কারিগরিবিদ্যার প্রশিক্ষণ দিয়ে তারপর কারিগরিবিদ্যার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদ্ধতির সঙ্গে তাদের অবহিত করার প্রক্রিয়া কি বেশি উপযোগী নয়? এখানে তাদের বলা হচ্ছে যে ৭ বছরের বালক-বালিকার মতো একেবারে গোড়া থেকে কারিগরিবিদ্যার মাধ্যমে সবকিছু শিখে নিতে এভাবে সব নতুন কৌশল রপ্ত করে একজন দক্ষ শিক্ষক বা শিক্ষিকা হয়ে উঠতে তো বহু সময় লেগে যাবে.....

গান্ধীজি—একেবারেই বেশি সময় লাগবে না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যখন আমার কাছে আসছেন তখন ধরেই নেওয়া যায় যে তাঁর মধ্যে গণিত এবং ইতিহাস বা অন্যান্য বিষয়ের একটা কাজ চালানোর মতো জ্ঞান রয়েইছে। এরপর আমি তাঁকে কার্ডবোর্ডের বাক্স বানাতে বা সুতো বুনতে শেখাব। তিনি যখন এই কাজটি করবেন তখন এই বিশেষ কারিগরিবিদ্যা থেকে কীভাবে গণিত, ইতিহাস এবং ভূগোলের জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন

তাও আমি তাকে বলে দেব। এইভাবেই তিনি ওই বিশেষ কারিগরিবিদ্যার সঙ্গে নিজের জ্ঞানের একটা যোগসূত্র খুঁজে পাবেন। এই কাজে তাঁর মোটেই বেশি সময় লাগবে না। এ প্রসঙ্গে আরেকটা উদাহরণ দেব। ধরুন আমার সাত বছরের ছেলেকে আমি একটি বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে নিয়ে গেলাম.....সেখানে আমরা দুজনেই সুতো বোনা শিখলাম। এখানে আমি আমার অর্জিত জ্ঞানের সঙ্গে সুতো বোনার এই নতুন বিদ্যার যোগসূত্র তৈরি করে নিতে পারব। কিন্তু আমার ছেলের কাছে সবটাই নতুন। সত্তর বছরের বাবার কাছের কিন্তু সবকিছু জানা জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ-পরিস্থিতিতে তাঁর পুরোনো জ্ঞান নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলেন। শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও যদি সাত বছরের বালক-বালিকাদের মতো নতুন কিছু জানার কৌতূহল বা শেখার উৎসাহ না থাকে তাহলে একদিন তাঁরা নিছকই যন্ত্র হয়ে পড়বেন, নতুন পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে আর তাল মিলিয়ে চলতে পারবেন না।

প্রশ্ন—এই মৌলিক শিক্ষা প্রকল্পটি রচনা করা হয়েছে গ্রামের কথা ভেবে। নগরবাসীর জন্য কি কোনও পরিকল্পনা নেই? তাঁরা কি সেই গতানুগতিক পথেই চলবেন?

গান্ধীজি—খুব ভালো প্রশ্ন। প্রাসঙ্গিকও বটে। 'হরিজন' পত্রিকায় আমার লেখায় ইতিমধ্যেই এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। দিনের কাজটা সেইদিনই সেরে রাখা সব সময় ভালো। আমাদের হাতে এখন প্রচুর কাজ। আমরা যদি সাত লক্ষ গ্রামের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারি, আমার মনে হয় এখনকার পক্ষে তা যথেষ্ট। শিক্ষাবিদরা নিঃসন্দেহে শহরগুলিকে নিয়ে ভাবছেন। আমরা যদি গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে শহরগুলিকে নিয়েও ব্যস্ত হয়ে পড়ি তাহলে আমাদের উদ্যোগ এলোমেলো হয়ে পড়বে।

প্রশ্ন—ধরুন একটা গ্রামে তিনটি বিদ্যালয় রয়েছে। এই তিনটি বিদ্যালয়ে আলাদা আলাদা তিন রকমের কারিগরিবিদ্যার প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। একটি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ অন্যটির চেয়ে বেশি। তাহলে এই তিনটি বিদ্যালয়ের মধ্যে কোনটিতে বাচ্চারা যাবে?

গান্ধীজি—এই ধরনের পরস্পর বিরোধী ঘটনা ঘটা উচিত নয়। তবে আমাদের দেশের বেশিরভাগ গ্রামই এত ছোট যে সেখানে একটার বেশি বিদ্যালয় থাকবে বলে মনে হয় না। তবে বড় গ্রামগুলিতে একাধিক বিদ্যালয় থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে দুটি বিদ্যালয়েই একই কারিগরিবিদ্যা শেখানো উচিত। তবে কঠোরভাবে কোনও নিয়ম বেঁধে দেওয়ায় আমি বিশ্বাসী নই। এই ধরনের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারিগরিবিদ্যার সুযোগ সুবিধাগুলির জনপ্রিয়তা বা সেগুলি শিক্ষার্থীদের মনে কতটা দাগ কাটতে পারছে তা খতিয়ে দেখতে হবে। তবে যে কারিগরিবিদ্যাকেই বেছে নেওয়া হোক না কেন তা যেন শিক্ষার্থীদের সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ ও সমান বিকাশ ঘটাতে পারে। এই কারিগরিবিদ্যা যেন গ্রামকেন্দ্রিক হয় এবং তা যেন কাজে লাগানো যায়।

প্রশ্ন—একটি সাত বছরের বালক যদি ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পেশা বেছে নিতে চায় তাহলে শুধু শুধু একটা কারিগরিবিদ্যা শিক্ষার জন্য জীবনের সাতটা বছর নষ্ট করবে কেন? একজন ব্যাংক কর্মীর ছেলে যদি ভবিষ্যতে নিজেও ব্যাংকে কাজ করতে চায় তাহলে সে সাত বছর ধরে সুতো বোনা শিখে কী করবে?

গান্ধীজি—এই নতুন শিক্ষা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যটা না জেনেই এই প্রশ্নটা করা হয়েছে। বুনিয়াদি এই শিক্ষা প্রকল্পে একজন বালক বা বালিকা কিন্তু কারিগরিবিদ্যা লাভের জন্যই বিদ্যালয়ে যাবে না। সে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে যাবে। সেখানে কারিগরিবিদ্যার মাধ্যমে তার মনের বিকাশ ঘটবে। যে ছেলেটি সাত বছর ধরে প্রাথমিক শিক্ষার এই নতুন পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করেছে সে সাধারণ বিদ্যালয়ে সাত বছর ধরে পড়া অন্য যেকোনও ছেলের তুলনায় অনেক ভালো ব্যাংকার হতে পারবে বলে আমার দাবি। সাধারণ স্কুলে পড়া ছেলেটি যখন ব্যাংকিং ক্ষেত্রে যাবে তখন তার কাজ করতে যথেষ্ট অসুবিধা হবে। কারণ তার সব ধরনের দক্ষতার বিকাশ তো ঘটেনি। তার ওপর তার মনে অনেক সংস্কার থাকবে। এই নতুন যে শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেছি তা কোনও অংশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার চেয়ে কম নয় এবং তা সত্ত্বেও এখানে কারিগরিবিদ্যাকে ছোট করে দেখানো হয় না—এই মূল বিষয়টা যদি আপনাদের বোঝাতে পেরে থাকি তাহলে বুঝব আমার আজকের পরিশ্রম সার্থক। এটা আর কিছুই নয়, বরং কারিগরিবিদ্যার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত এক সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনা।

প্রশ্ন—প্রতিটি বিদ্যালয়ে একাধিক কারিগরিবিদ্যার প্রশিক্ষণ রাখার ব্যবস্থা করলে ভালো হয় না কি? কারণ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই জিনিস শিখতে শিখতে বাচ্চাদের মধ্যে তো একঘেয়েমি চলে আসবে।

গান্ধীজি—এক মাস সুতো বোনা শেখানোর পর আমি যদি দেখি কোনও শিক্ষক নিজেই উদ্যম হারিয়েছেন তাহলে আমিই তাঁকে বরখাস্ত করব। একই বাদ্যযন্ত্রে যেমন প্রতিদিনই নতুন নতুন সুর তোলা যায়, তেমনি পাঠদানের মধ্যেও নতুনত্ব আনা যায়। শিক্ষার্থীদের যদি শুধু নতুন নতুন কারিগরিবিদ্যা শিখে যেত তাহলে তাদের অবস্থা ওই এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে বেড়ানো হনুমানের মতো হবে। তারা কোথাও আর থিতু হতে পারবে না। এই আলোচনায় আমি ইতিমধ্যেই বলেছি যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে যদি সুতো বোনার কাজটাই শেখানো যায় তাহলে তার সঙ্গে শিক্ষার আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় চলে আসবে। কাজটা তখন শুধু সুতো বোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বাচ্চারা তখন 'তকলি'টাকেই নিজেদের ওপরে ওঠার সিঁড়ি বানিয়ে ফেলতে পারবে। তাই যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে আবার ফিরে যাব। শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে এই কারিগরিবিদ্যাকে বিচার করেন তাহলে তাঁরা তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে জ্ঞানার্জনের বহু পথ খুলে দিতে পারবেন। এতে ছাত্রছাত্রীদের সমস্ত রকম দক্ষতা ও গুণাবলির বিকাশের পথ প্রশস্ত হবে। ❑

[SEGAON—ফেব্রুয়ারি-৯, ১৯৩৯, 'হরিজন'-১৮/২/১৯৩৯ এবং ৪/৩/১৯৩৯ 'কালেক্টেড ওয়ার্কস অফ মহাত্মা গান্ধী খণ্ড'-LXVIII থেকে এই অংশ উদ্ধৃত'।]

শিক্ষা-ঋণ সংক্রান্ত এক-জানালা ব্যবস্থা

যে সব বিদ্যার্থী শিক্ষা-ঋণ নিতে আগ্রহী, তাঁদের স্বার্থে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে (১৫ আগস্ট, ২০১৫) একটা ওয়েব-ভিত্তিক পোর্টাল চালু করা হয়। নাম 'বিদ্যা লক্ষ্মী' (www.vidyalakshmi.co.in)।

২০১৫-১৬ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে বিদ্যার্থীদের জন্য তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক আর্থিক সহায়তা কর্তৃপক্ষ (স্টুডেন্ট ফাইন্যানশিয়াল এড্ অথরিটি) স্থাপন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য প্রধানমন্ত্রী বিদ্যা লক্ষ্মী কার্যক্রম (PMVLK)-এর মাধ্যমে ছাত্রবৃত্তি আর শিক্ষা-ঋণ প্রকল্পগুলোর পরিচালন ও নজরদারি করা, যাতে কোনও বিদ্যার্থী অর্থের অভাবের জন্য উচ্চতর শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না থেকে যায়। পোর্টালের সূচনা এই দিশায় প্রথম পদক্ষেপ। বিদ্যা লক্ষ্মী পোর্টাল এ ধরনের প্রথম পোর্টাল যার মাধ্যমে এক-জানালা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা সরকারি ছাত্রবৃত্তির পাশাপাশি ব্যাংকের শিক্ষা-ঋণ সম্পর্কে সব তথ্য পেতে পারে আর আবেদনও জমা দিতে পারে। এই পোর্টালের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

- ব্যাংকের শিক্ষা-ঋণ সম্পর্কে তথ্যাবলি
- বিদ্যার্থীদের জন্য সর্বজনীন আবেদনপত্র
- বিদ্যার্থীরা একাধিক ব্যাংকে শিক্ষা-ঋণের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবে
- ব্যাংকগুলো বিদ্যার্থীদের আবেদনপত্র ডাউনলোড করার সুবিধা পাবে
- ব্যাংকগুলো শিক্ষা-ঋণের প্রক্রিয়াকরণের অবস্থান আপলোড করতে পারে
- শিক্ষা-ঋণ সংক্রান্ত অভিযোগ বা প্রশ্ন থাকলে বিদ্যার্থীরা তা ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে ই-মেল করতে পারে
- শিক্ষা-ঋণের জন্য করা আবেদনের অবস্থান বিদ্যার্থীরা 'ড্যাশবোর্ড' থেকেই জানতে পারে
- জাতীয় ছাত্রবৃত্তি পোর্টাল-এর সঙ্গে সংযোগ (লিঙ্কেজ), যেখানে বিদ্যার্থীরা সরকারি ছাত্রবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য পেতে পারে আর আবেদনও জমা দিতে পারে।

এখনও পর্যন্ত ১৩টা ব্যাংক বিদ্যা লক্ষ্মী পোর্টালে ২২টা শিক্ষা-ঋণ প্রকল্প নথিভুক্ত করেছে। আর স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, আইডিবিআই ব্যাংক, ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, কানাড়া ব্যাংক ও ইউনিয়ান ব্যাংক—এই ৫টা ব্যাংক বিদ্যার্থীদের শিক্ষা-ঋণের প্রক্রিয়াকরণের অবস্থান জানাতে বিদ্যা লক্ষ্মী পোর্টালের সঙ্গে নিজেদের ব্যবস্থার সমন্বয় করেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য শিক্ষা-ঋণ প্রদানকারী সবকটা ব্যাংককে এর আওতায় আনা। আশা করা হচ্ছে যে সব ব্যাংকের শিক্ষা-ঋণ সংক্রান্ত একটা এক-জানালা ব্যবস্থা স্থাপন করার জন্য সরকারের এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের সর্বত্রই ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হবে।❑

হাতে চালানো তাঁতে বোনা পণ্যের ই-মার্কেটিং

ভারত সরকার হাতে চালানো তাঁতে বোনা পণ্যের (হ্যান্ডলুম প্রোডাক্টস) ই-মার্কেটিং বা বৈদ্যুতিন বাজারকরণের জন্য নীতি-কাঠামোর সূচনা করেছে, যার উদ্দেশ্য সামগ্রিকভাবে হ্যান্ডলুমের বিপণনের বিস্তার করা আর বিশেষত, যুব প্রজন্মের কাছে একে জনপ্রিয় করে তোলা।

এই নীতি-কাঠামো অনুযায়ী, হ্যান্ডলুমের ই-মার্কেট প্রসারিত করতে 'অফিস অব ডি সি (হ্যান্ডলুমস)' বা হ্যান্ডলুমের উন্নয়ন কমিশনারের দপ্তর অনুমোদিত ই-কমার্স বা বৈদ্যুতিন বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও কার্যোপযোগীভাবে সহযোগিতা করবে। যে কোনও ই-কমার্স সংস্থা গাঁটছড়া বাঁধার জন্য সরাসরি এই দপ্তরে আবেদন জানাতে পারে। আবেদনকারীর অতীতের কৃতি ও আয়ের মতো বিষয়গুলো ভালোভাবে খতিয়ে দেখার পরই সংশ্লিষ্ট নির্বাচন সমিতি সুপারিশ করবে। এ ক্ষেত্রে হাতে চালানো তাঁতে বোনা পণ্য উৎপাদনকারী এলাকাগুলোর মধ্যে কোনও কোনও এলাকাকে ই-মার্কেটিং-এর আওতায় রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে আর প্রসারের প্রস্তাবের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিন সপ্তাহের মধ্যে আবেদনের প্রক্রিয়াকরণ শেষ করা হবে। অনুমোদন পাওয়ার পর ই-কমার্স সংস্থাকে তার হোম-পেজে (ওয়েবসাইটের প্রথম পাতা) হাতে চালানো তাঁতে বোনা পণ্য প্রদর্শিত করতে হবে আর সেখান থেকেই 'ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম' বা হ্যান্ডলুম মার্কা হাতে চালানো তাঁতে বোনা পণ্যগুলোর জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটা আলাদা বিভাগের হদিশ পাওয়া যাবে অনায়াসেই। এছাড়া হ্যান্ডলুমের বিপণনের বিস্তার করতে হ্যান্ডলুমের উন্নয়ন কমিশনারের দপ্তরও আলাদাভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেবে :

- অনুমোদিত ই-কমার্স সংস্থার নাম ও অন্যান্য তথ্য দপ্তরের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে, আর এ সব তথ্যই দপ্তরের তাঁতি পরিষেবা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মাধ্যমেও প্রচার করা হবে
- তাঁতি পরিষেবা কেন্দ্র আর প্রধান তাঁত শিল্প গুচ্ছের মাধ্যমে প্রয়োজন অনুযায়ী ই-কমার্সের সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে
- দপ্তরের ওয়েবসাইটে হাতে চালানো তাঁতে বোনা ঐতিহ্যবাহী পণ্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে যাতে এর সাহায্যে অনুমোদিত ই-কমার্স সংস্থা তার পণ্য তালিকার মাধ্যমে নিজের খদ্দেরকে অবহিত করতে পারে
- তাঁতি আর তাঁত-উদ্যোগপতিদের ই-কমার্সের সুযোগ নিতে সাহায্য করতে তাঁতি পরিষেবা কেন্দ্র, সাধারণ পরিষেবা কেন্দ্র ও তাঁত শিল্প গুচ্ছে তথ্য-প্রযুক্তি পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা হবে (লভ্যতা ও স্থান সাপেক্ষ)।

অনুমোদিত ই-কমার্স সংস্থার কার্যকলাপের উপর ক্রমাগত নজর রাখা হবে; তাদের কাজের ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে তাদের অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে। হ্যান্ডলুম পণ্যের প্রাথমিক উৎপাদক (অর্থাৎ তাঁতি) আর গ্রাহকের স্বার্থ রক্ষা করতে এই নীতি-কাঠামো সময়মতো বাস্তব পরিস্থিতি ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পুনর্বিবেচনা করা হবে। সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগ যেমন জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস পালন আর 'ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম' মার্কা-ব্র্যান্ডের সূচনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই নীতি-কাঠামো তাঁত শিল্পে সমৃদ্ধির জোয়ার আনবে বলে আশা করা যায়।❑

জানেন কি ?

ডিজি-লকার

'ডিজি-লকার' ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এ এক ডিজিটাল কোষ বা সিন্দুক যেখানে জন্ম শংসাপত্র, সম্পত্তির দলিলের মতো নথিপত্র বিনামূল্যে সংরক্ষণ করা যায়। কাগজের নথির আদান-প্রদান একেবারে কমিয়ে আনা আর ই-ডক্যুমেন্ট (বৈদ্যুতিন নথিপত্র)-এর আদান-প্রদান চালু করাই এর মূল উদ্দেশ্য। ডিজি-লকারের প্রধান দুটো উপাদান হল সংগ্রহস্থল বা ভাণ্ডার (রিপসিটরি) আর প্রবেশপথ (অ্যাকসেস গেটওয়ে)। রিপসিটরি প্রেরকদের দ্বারা একটা আদর্শ রূপে (স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম্যাট) আপলোড করা ই-ডক্যুমেন্টের সম্ভার। এক গুচ্ছ আদর্শ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস (এপিআই বা নির্দিষ্ট পদক্ষেপের সমষ্টি)-এর মাধ্যমে প্রকৃত সময়ে সুরক্ষিতভাবে এসব নথি খুঁজে পাওয়া যায়। অ্যাকসেস গেটওয়ে-তে আবেদনকারীরা যাতে ই-ডক্যুমেন্ট ইউআরআই ব্যবহার করে বিভিন্ন রিপসিটরিতে সংরক্ষিত ই-ডক্যুমেন্টগুলো সুরক্ষিতভাবে অনলাইনে (অর্থাৎ ইন্টারনেটের মাধ্যমে) প্রকৃত সময়ে পেতে পারেন সে ব্যবস্থা আছে। ইউআরআই (ইউনিফর্ম রিসোর্স ইন্ডিকেটর) হল প্রেরকদের দ্বারা রিপসিটরিতে আপলোড করা ই-ডক্যুমেন্টের লিঙ্ক (যোগসূত্র)। ইউআরআই-র ভিত্তিতে গেটওয়ে চিহ্নিত করবে যে কোন রিপসিটরিতে সংশ্লিষ্ট ই-ডক্যুমেন্ট সংরক্ষিত করা আছে আর তারপর সেই রিপসিটরি থেকে ই-ডক্যুমেন্টটা আবেদনকারীর সমক্ষে পেশ করবে। ই-ডক্যুমেন্টের আদান-প্রদান নিবন্ধীকৃত রিপসিটরির মাধ্যমে হয় বলে অনলাইন নথিগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা সুনিশ্চিত। 'ক্লাউড' বা 'সাইবার স্পেস'-এ বিনামূল্যে ডিজিটাল লকার খোলা নতুন ই-মেল অ্যাকাউন্ট সৃষ্টি করার মতো সহজ। এর জন্য প্রয়োজন শুধু আধার কার্ড আর একটা লিঙ্ক করা মোবাইল ফোনের নম্বর। নথি ও শংসাপত্রের ই-ডক্যুমেন্ট আর সেগুলোর লিঙ্ক সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করার জন্য ব্যক্তিগত জায়গা প্রদান করে ডিজি-লকার। নতুন ডিজি-লকার খুলতে গেলে শুধু আধার নম্বর প্রবেশ করতে হয়। আধার নম্বরের জন্য তালিকাভুক্তিকরণের সময় যে মোবাইল ফোন নম্বর আপনি লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন, সেই নম্বরে এসএমএস করে ওয়ান-টাইম-পাসওয়ার্ড বা ওটিপি (এককালীন গুপ্ত সংকেত) পাঠানো হবে। নতুন ডিজি-লকার খোলার ক্ষেত্রে এই ওটিপি ছাড়া প্রথমবার প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তবে পরবর্তীকালে আপনি নিজে নতুন পাসওয়ার্ড ঠিক করে নিতে পারেন, অথবা নিজের গুগ্‌ল বা ফেসবুক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ডিজি-লকার লিঙ্ক করেও লগ-ইন করতে পারেন। মূল ভাবনাটা হচ্ছে কাগজের নথির আদান-প্রদানের প্রয়োজন একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা। ধরা যাক, আপনার জন্ম ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত শংসাপত্র ডিজি-লকারে রাখা আছে। আপনি যখন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবেন, তখন পাসপোর্ট দপ্তর আপনার আধার নম্বর ব্যবহার করে ডিজি-লকার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করে আপনার দেওয়া তথ্য যাচাই করে নেবে। ফলে, আপনার আর একটা নথি-ভর্তি বড় ফাইল নিয়ে ছুটোছুটি করতে হবে না। আপনি নথিগুলো স্ক্যান করে আপলোড করতে পারেন, যা প্রয়োজনে ডিজিটালভাবে স্বাক্ষর (ডিজিটাল সিগনেচার) করা যেতে পারে। সরকার দ্বারা প্রেরিত আপনার ই-ডক্যুমেন্টগুলোরও সংগ্রহস্থল এই লকার। এ সব ই-ডক্যুমেন্টগুলো প্রেরকরা (যেমন সরকারি দপ্তর বা কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সিবিএসসি, নিয়ামক দপ্তর, আয়কর বিভাগের মতো সরকারি সংস্থা, প্রভৃতি) নিজেই ডিজিটাল লকারের প্রযুক্তিগত নীতি অনুযায়ী এক্সএমএল ফাইল ফর্ম্যাট-এ আপলোড করে। যেসব নথি আপনি নিজে আপলোড করছেন, সেগুলো ই-মেল মারফত পাঠানো যেতে পারে। কিন্তু সরকারি কর্তৃপক্ষ-প্রেরিত ই-ডক্যুমেন্ট শুধু ব্যাংক, বিশ্ববিদ্যালয়, পাসপোর্ট দপ্তর বা পরিবহণ বিভাগের মতো সংস্থা আবেদনের মাধ্যমে দেখার সুযোগ পেতে পারে।❑

ই-বস্তা

ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করতে সম্প্রতি ভারত সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পের আওতায় এক নতুন উদ্যোগের সূচনা করেছে যার নাম ই-বস্তা (হিন্দিতে বস্তা শব্দের অর্থ স্কুল-ব্যাগ)। এই নাম অত্যন্ত জুতসই কারণ, ই-বস্তার মাধ্যমে স্কুলের পাঠ্য বই আর অধ্যয়ন সামগ্রী ডিজিটাল ও ই-বুকের রূপে মজুত করা হয়েছে। বই প্রকাশক এবং স্কুলের শিক্ষক ও পড়ুয়াদের একই মঞ্চে আনা সম্ভব হয়েছে। বিভিন্ন বইয়ের (তা বিনামূল্যের বই হোক বা বাণিজ্যিক) প্রকাশকদের ও স্কুলগুলোকে একইসঙ্গে একই মঞ্চে আনাটাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। ওয়েব-পোর্টালের পাশাপাশি এই বিপুল শিক্ষা-সম্পদ সুষ্ঠুভাবে সাজানো আর সামলানোর জন্য একটা আলাদা কাঠামোও (ব্যাক-এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক) গড়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়াও রয়েছে ওয়েব-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যা ট্যাবলেটে ইনস্টল করলে এই কাঠামোকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কাঠামো পোর্টাল হিসেবে ব্যবহার করলে তিন ধরনের অংশীদারকে একই ছাতার তলায় আনা সম্ভব হয়—প্রকাশক, স্কুল আর পড়ুয়া। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন

অনুযায়ী শিক্ষকরা ই-বুক আর অন্যান্য ডিজিটাল পাঠ্য-বস্তু সাজিয়ে একটা ই-বস্তা সৃষ্টি করতে পারেন। ঠিক যেমন প্রতিটা শ্রেণি বা পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এক ব্যাগ স্কুলের বই সাজানো হয়। নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষকরা টেক্সট (পাঠ্যাংশ), সিমুলেশন, অ্যানিমেশন, অডিও, ভিডিও, ইত্যাদি বেছে নিতে পারেন। সহজলভ্য উদ্দীপিত টেক্সট, চার্ট (বর্ণনাচিত্র), গ্রাফিক্স (চিত্রলেখ), অডিও আর ভিডিও পড়ুয়াদের জ্ঞান আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। তাদের শিক্ষকরা যে ই-বস্তা সৃষ্টি করেছেন, পড়ুয়ারা চাইলে সহজেই তা ডাউনলোড করে নিতে পারে। ডিজিটাল রূপে থাকার কারণে সব কিছুই যে কোনও ডিভাইস বা ডিজিটাল যন্ত্রে সংগ্রহ করে রাখা যেতে পারে, তা কপি (প্রতিলিপি) বা শেয়ার (আদান-প্রদান) করা যেতে পারে। সংক্ষেপে বলতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পড়াশোনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সুলভ ও সহজে বহনীয় করে তোলা সম্ভব হয়েছে এই মঞ্চের মাধ্যমে। বাড়তি বোঝার ঝঞ্ঝাট ছাড়াই তারা এখন যেখানে-সেখানে যখন-তখন পড়তে পারে। বই প্রকাশকরা ই-বস্তার মাধ্যমে হাজার হাজার স্কুলে পৌঁছাতে পারছেন, অথচ ছাপানো, পরিবহণ ও বিলি করা সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার কথা আর তাঁদের চিন্তা করতে হয় না। ডিজিটাল রূপেই তাঁরা তাঁদের বই তালিকাভুক্ত করে বিক্রি ও বিতরণ করতে পারেন। ই-বস্তার মাধ্যমে শিক্ষক ও পড়ুয়াদের সরাসরি প্রকাশকদের কাছে নিজেদের মতামত জানানোর সুযোগ রয়েছে। ই-বস্তায় ডিজিটাল রাইটস ম্যানেজমেন্ট (ডিআরএম) বা ডিজিটাল অধিকার পরিচালন ব্যবস্থা থাকায় প্রকাশকদের বইয়ের কালোবাজারি নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। পোর্টালে 'ই-বস্তা অ্যাপ' বিনামূল্যে পাওয়া যায় আর তা যে কোনও অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইসে ব্যবহার করা যেতে পারে।❑

যো ❖ জ ❖ না ❖ ডা ❖ য়ে ❖ রি

(১ আগস্ট—১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫)

বহির্বিশ্ব

● **জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় হাসিনার স্বীকৃতি :**

জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় তাঁর যোগ্য নেতৃত্বের জন্য স্বীকৃতি পেলেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে পুরস্কৃত করতে চলেছে রাষ্ট্রসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি—ইউএনইপি।

২৭ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সদর দফতরে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে হাসিনার হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে। পিছিয়ে পড়া দেশ হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় হাসিনারা যে পথ দেখিয়েছেন, তা গোটা বিশ্বের অনুসরণ করা উচিত বলে মন্তব্য করেছে রাষ্ট্রসংঘ।

● **অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম টার্নবুল :**

দলীয় ভোটে জিতে অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন ম্যালকম টার্নবুল। আর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর পদ খোয়ালেন টনি অ্যাবট।

লিবারাল দলের ৫৪টি ভোট পেয়েছেন টার্নবুল। সেখানে অ্যাবটের ভাগ্যে জুটেছে ৪৪টি ভোট। টনি অ্যাবটের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন ম্যালকম টার্নবুল। অ্যাবটের সঙ্গে মতপার্থক্য হওয়ায় তিনি মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। এর পরে দলের মধ্যেই টনি অ্যাবটের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন তিনি। সরে দাঁড়াতে রাজি ছিলেন না টনি অ্যাবট। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধ ভোটাভুটিতে পর্যন্ত গড়ায়। আর জয়ী হন ম্যালকম টার্নবুল।

● **ভোটে দাঁড়াবেন সৌদি মহিলারা :**

দেশের মহিলাদের প্রথমবার ভোটে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিয়ে নতুন ইতিহাস গড়ল সৌদি আরব। এ বছরের ডিসেম্বরে ভোট। ভোটার এবং প্রার্থীদের নাম নথিভুক্তির কাজ চলবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

প্রতি পদে পদে অনেক বাধা। সে দেশে মহিলাদের সামান্য গাড়ি চালাতে দিতেও আপত্তি। তবু কিছু দিন আগেই স্থানীয় নির্বাচনে ভোটার হিসেবে স্বীকৃতি পেতে এগিয়ে এসেছিলেন মহিলারা। সেখান থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর সুযোগ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া, সন্দেহ নেই।

● **নেপালে ফের ভূমিকম্প, মৃদু কম্পন এ রাজ্যেও :**

ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল নেপাল। ২৩ আগস্ট বিকেল ৩টে নাগাদ এই কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনমাত্রা ছিল ৫। ভূমিকম্পের উৎস ছিল নেপালের কোডারি জেলা। এই কম্পনের প্রভাব পড়ে শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতেও। আতঙ্কে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এ বছরের ২৫ এপ্রিল নেপালে ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর গত তিন মাস ধরে মাঝারি এবং স্বল্পমাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে সেখানে। রিখটার স্কেলে সেই কম্পনমাত্রা ৪-এর আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছিল।

● **শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী বিক্রমসিঙ্ঘেই :**

১৮ আগস্ট ভোটের ফল বেরোতে দেখা গেল, ফের শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী পদে থাকছেন রনিল বিক্রমসিঙ্ঘেই। আবার পরাজিত হয়েছে শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মাহিন্দা রাজাপক্ষে। বিক্রমসিঙ্ঘের দল ইউএনপি ৯৩টি ও রাজাপক্ষের ইউপিএফএ ৮৩টি আসন পায়।

গত জানুয়ারিতে নির্বাচনে হেরে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরতে হয়েছে মাহিন্দা রাজাপক্ষেকে। ফের ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে।

● **ইরাকে নির্বাচন কর্মীদের গণহত্যা :**

ইরাকের নির্বাচন কমিশনের হয়ে কাজ করায় ৩০০ জন আমলাকে খুন করল আইএস। উত্তর ইরাকের মসুলের কাছে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে ইরাকি সরকার। নিহতদের মধ্যে ৫০ জন মহিলা রয়েছেন বলে জানিয়েছে তারা। ইরাকি নির্বাচন কমিশনের দাবি, তাদের আরও এক দল কর্মীকে মসুলেই গলা কেটে খুন করেছে আইএস জঙ্গিরা।

● **ব্যাঙ্ককে বিস্ফোরণ :**

গত ১৭ আগস্ট জোরালো বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাঙ্ককের প্রাণকেন্দ্র রাচাপ্রাসং এলাকা। জনপ্রিয় ব্রহ্মা মন্দিরের সামনে সেই বিস্ফোরণে নিহত হন ২০ জন।

বিস্ফোরণের পর দিনই মূল সন্দেহভাজনের ছবি প্রকাশ করেছিল থাই পুলিশ। বিস্ফোরণের বারো দিন পরে অবশেষে মূল সন্দেহভাজন গ্রেফতার হল। ধৃত জঙ্গির সঙ্গে সেই ছবি অনেকটাই মিলে যাচ্ছে বলে দাবি করেছেন তদন্তকারীরা। বছর আঠাশের ওই জঙ্গির বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে অসংখ্য পাসপোর্ট। সেই সঙ্গেই মিলেছে বিস্ফোরক তৈরির উপকরণও।

● **এবার পাকিস্তানেও নিষিদ্ধ আইএস :**

পশ্চিম এশিয়ার সক্রিয় জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস-কে নিষিদ্ধ করল পাকিস্তান। তালিবান-আল কায়দার বদলে আইএস পাক-আফগান সীমান্তে শক্তিশালী হয়ে উঠছে বলে মনে করছে দিল্লিও।

ভারতীয় গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ইসলামি জঙ্গিগোষ্ঠীকে মদত দিলে নিজেদেরও যে ভুগতে হয় তা টের পেয়েছে পাকিস্তান। তাই আইএস দমনে সক্রিয় হয়েছে তারা। সম্প্রতি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী এলাকায় আইএস কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলে ধারণা পাকিস্তান-সহ বেশ কিছু দেশের গোয়েন্দাদের।

এই দেশ

● **৭/১১ লোকাল ট্রেন বিস্ফোরণে দোষী ১২ :**

২০০৬ সালের ১১ জুলাই সন্ধেবেলা লোকাল ট্রেনে একের পর এক বিস্ফোরণে ১১ মিনিটে ৭ বার কেঁপে উঠেছিল বাণিজ্যনগরী মুম্বই। ন' বছর পর সেই মামলায় দোষী সাব্যস্ত হল ১২ জন। মুম্বইয়ের বিশেষ আদালতের (মোকোকা) বিচারক যতীন ডি শিন্দে এই রায় ঘোষণা করেন।

২০০৬ সালেরই নভেম্বর মাসে ৩০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছিল সন্ত্রাস দমন শাখা (এটিএস)। তবে তাদের মধ্যে শুধু ১৩ জনকে ধরতে পারে পুলিশ। পলাতক বাকি ১৭ জনের মধ্যে বেশ কিছু পাক নাগরিক আছে বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের। ধৃত ১৩ জনের মধ্যে ১২ জনের বিরুদ্ধেই অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে। বেকসুর ছাড়া পেয়ে গিয়েছেন এক অভিযুক্ত।

● **বাল্য-বিবাহ রুখতে নতুন অভিযান :**

বাল্য-বিবাহ রুখতে নতুন অভিযান শুরু করবেন প্রধানমন্ত্রী। যার স্লোগান, 'পহলে পড়াই, ফির বিদাই'। অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষা ও পরে বিবাহ—পড়াশোনা সম্পূর্ণ করার পরে সাবালিকা হয়ে বিয়ে। এ বছর স্বাধীনতা দিবসে ঝাড়খণ্ডে ঠিক এ ধরনের একটি প্রকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। ঝাড়খণ্ডের মডেলই অনুসরণ করতে আগ্রহী কেন্দ্র।

এ দেশে ২০০৬ সালে আইন করে বাল্য-বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু রেওয়াজ এখনও থামেনি। সমীক্ষা বলে, এখনও দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয় ১৮ বছরের নীচে। গ্রামের গরিব পরিবারে সেই সংখ্যাটি ক্রমশই বাড়ছে। নাবালিকা ছাত্রীদের স্কুলমুখী করতে প্রতিটি রাজ্যের এই ধরনের সফল প্রকল্পগুলোই এবার এক ছাতার তলায় এনে নতুন অভিযান শুরু করতে আগ্রহী কেন্দ্র।

● **নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা :**

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা করা হবে। থাকবে না লোডশেডিং। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দাবি করেন, আগামী সাত বছরের মধ্যে দেশের সর্বত্র ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুতের ব্যবস্থা করবে সরকার।

শিক্ষক দিবসের আগে নয়াদিল্লিতে দেশের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই অনুষ্ঠানেই এক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি এ কথা বলেন।

চলতি বছরে দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে ১০৪৮ বিলিয়ন ইউনিট। আগামী বছরে তা প্রায় ৮.৫ শতাংশ বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র।

● **প্রথম সৌরশক্তি-চালিত বিমানবন্দর কোচিতে :**

বিশ্বের প্রথম সৌরশক্তি পরিচালিত বিমানবন্দরের সম্মান লাভ করেছে কোচি। ২০ আগস্ট কেরলের মুখ্যমন্ত্রী উমেন চান্ডি সৌরশক্তি জোগানের একটি প্ল্যান্ট উদ্বোধন করেছেন কোচিতে।

৪৫ একর জায়গা নিয়ে তৈরি, ৪৬১৫০টি সোলার প্যানেল যুক্ত, ১২ মেগাওয়াটের এই প্ল্যান্টটি একাই বিমানবন্দর পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। বিদ্যুতের জন্য অন্য কোনও মাধ্যমের উপর আর নির্ভর করতে হবে না কোচিকে। জানা গিয়েছে, দিনে ৫০০০০ থেকে ৬০০০০ ইউনিট সৌরবিদ্যুৎ পাওয়া যাবে এই প্ল্যান্ট থেকে।

● **ট্রেনেও বিমানের মতো শৌচালয় :**

চিরাচরিত শৌচালয়ের পরিবর্তে বিমানের মতো ট্রেনেও 'ভ্যাকুয়াম টয়লেট' চালু করতে চলেছে রেল। রেলমন্ত্রক সূত্রে খবর, ১৪ সেপ্টেম্বর থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে ডিব্রুগড়-রাজধানী এক্সপ্রেসে এ ধরনের টয়লেট চালু করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে শতাব্দী এক্সপ্রেসে এ ধরনের আরও ৮০টি টয়লেট লাগানো হবে বলে রেল সূত্রে খবর। এই প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত রেলের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, এসি কোচের সঙ্গে এ ধরনের একটি টয়লেট তৈরিতে খরচ হবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। প্রচলিত টয়লেটের তুলনায় 'ভ্যাকুয়াম টয়লেট'-এ জলের ব্যবহার কম হয়। ফলে, পরিবেশ-বান্ধব হওয়া ছাড়াও এর ব্যবহারে রেললাইনে ক্ষয়ের মাত্রাও নামমাত্র।

● **ট্রেনের টিকিট মেশিন ও অ্যাপে :**

হাওড়া ও শিয়ালদহে চালু হল অটোমেটিক টিকিট ভেন্ডিং মেশিন। একই সঙ্গে মুম্বই-চেন্নাই-দিল্লির পর শিয়ালদহ-হাওড়ার যাত্রীদের জন্যও মোবাইলের মাধ্যমে অসংরক্ষিত শ্রেণিতে টিকিট কাটার সুবিধা আসতে চলেছে।

হাওড়া এবং শিয়ালদহে দুটি অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিনে ১০ ও ৫ টাকার কয়েনের সঙ্গে স্মার্ট কার্ডও ব্যবহার করা যাবে। স্মার্ট কার্ডে মিলবে ৫ শতাংশ বোনাস। আগামী আর্থিক বছরে আরও ৬৫টি মেশিন বসবে বলে রেল সূত্রের খবর। পাশাপাশি, দিল্লিতে মোবাইলের মাধ্যমে অসংরক্ষিত শ্রেণিতে টিকিট কাটার পরিষেবা চালু হল। রেলের বক্তব্য, এই পরিষেবা শুরু হবে শিয়ালদহ ও হাওড়ার ট্রেনেও।

● **গ্যাস সংযোগ অনলাইনে :**

দিল্লি-কলকাতা-সহ ১৩টি শহরে অনলাইনে রান্নার গ্যাসের সংযোগের জন্য আবেদন করার ব্যবস্থা 'সহজ' চালু করেছে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক। এই ব্যবস্থায় অনলাইনেই ফর্ম পূরণ করে, পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণপত্রের কপি আপলোড করে দেওয়া যাবে। গোটা দেশেই খুব শীঘ্র এই ব্যবস্থা চালু হবে।

উল্লেখ্য, নরেন্দ্র মোদীর আবেদনে সাড়া দিয়ে এখনও পর্যন্ত ২৫ লক্ষ মানুষ রান্নার গ্যাসে ভরতুকি ছেড়ে দিয়েছেন। কেন্দ্রীয়

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন তার বদলে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ২২ লক্ষ পরিবারে রান্নার গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

● **আইএস-এর বিরুদ্ধে ধর্মগুরুরা :**

ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গিদের ইসলাম-বিরোধী ও 'সভ্যতার শত্রু' আখ্যা দিয়ে ওই সংগঠনের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন ভারতের প্রায় এক ডজন উলেমা ও মুসলিম ধর্মগুরু। এঁরা সকলেই দেশের প্রভাবশালী ইসলামি ধর্মীয় সংগঠনগুলির প্রধান।

আরব দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বান কি মুনের কাছেও আগস্ট মাসে জামা মসজিদের শাহি ইমাম, অজমের শরিফ দরগার প্রধান এবং উলেমা কাউন্সিল ও দারুল উল মহম্মদিয়া-র মতো দেশের ১২টি সংগঠনের প্রধানের স্বাক্ষরিত ১৫ খণ্ডের ফতোয়াটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে।

এই রাজ্য

● **স্বচ্ছ ভারত অভিযানে এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গ :**

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে একেবারে উপরের সারিতে জায়গা করে নিল পশ্চিমবঙ্গ। এই অভিযানের সূচনার পর বছর ঘোরার আগেই দেশের বিভিন্ন শহরের পরিচ্ছন্নতার যে ছবি, তাতে দেখা যাচ্ছে, তালিকার শীর্ষে থাকা একশো শহরের মধ্যে পঁচিশটিই পশ্চিমবঙ্গের। হালিশহর দশম স্থানে। কলকাতা ছাপ্পান্নতে জায়গা করে নিয়েছে।

দেশের শহরগুলিকে পরিচ্ছন্ন করে তোলার পরিকল্পনা সামনে রেখে গত বছরের ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত অভিযান শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কর্ণাটকের মহীশূর দেশের ৪৭৬টি শহরের মধ্যে স্বচ্ছতার অভিযানে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে। সে রাজ্যের আরও তিনটি শহর প্রথম দশে।

● **লগ্নি টানায় রাজ্য শেষের পাঁচে :**

রিজার্ভ ব্যাংকের রিপোর্ট বলছে, গত আর্থিক বছরে লগ্নির হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ শেষ পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে।

দেশে এক বছরে যে লগ্নি এসেছে, তার মাত্র ১.৩ শতাংশ জুটেছে রাজ্যের ভাগ্যে। প্রত্যাশা মতোই প্রথম সারিতে রয়েছে মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, গুজরাত, অন্ধ্রপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলি। তবে প্রকল্পের সংখ্যা কম হলেও বড় মাপের লগ্নি এনে সকলকে পিছনে ফেলে দিয়েছে ওড়িশা।

রিজার্ভ ব্যাংকের হিসেব বলছে, শুধু গত অর্থ বছর নয়। গত পাঁচ বছর ধরেই, অর্থাৎ ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫-র হিসেব করলেও পশ্চিমবঙ্গ থেকেছে পিছনের সারিতেই।

● **উত্তরবঙ্গে ৫০ শয্যার আয়ুষ হাসপাতালের প্রস্তাব :**

আয়ুষ, অর্থাৎ আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধা ও হোমিওপ্যাথি। এবার উত্তরবঙ্গের তপসিখাটা-য় একটি আয়ুষ হাসপাতাল তৈরি হবে বলে জানিয়েছেন আয়ুষমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উত্তরবঙ্গে প্রায় ২৫ একর জমির উপর প্রস্তাবিত আয়ুষ হাসপাতালে ৫০টি শয্যা থাকবে এবং সেখানে আয়ুষের অন্তর্গত চিকিৎসা পদ্ধতির অনেক চিকিৎসকেরই কর্মসংস্থান হবে বলে মন্ত্রী জানান।

● **রাজ্যে চার 'স্মার্ট সিটি' :**

২৭ আগস্ট মোট ৯৮টি প্রস্তাবিত 'স্মার্ট সিটি'-র তালিকা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। আর তার মধ্যে জায়গা করে নিল পশ্চিমবঙ্গে চারটি শহর—নিউটাউন, বিধাননগর, হলদিয়া ও দুর্গাপুর।

প্রথম বছরে ২০টি শহরকে 'স্মার্ট সিটি'-তে পরিণত করার কাজ শুরু হবে। তার মধ্যে ওই চার শহর থাকবে কিনা তা একটি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জানা যাবে।

সরকারি মনোনয়নের ভিত্তিতে সবথেকে বেশি 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলা হবে উত্তরপ্রদেশে। মোট ১৩টি। তবে প্রত্যেক রাজ্যে যেন অন্তত একটি করে 'স্মার্ট সিটি' গড়ে তোলা যায় সে দিকে নজর রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

● **বাড়ির ছাদে সৌর বিদ্যুৎ তৈরিতে জোর :**

বাড়ির ছাদে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর আরও বেশি জোর দেবে রাজ্য সরকার। এই ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী তিন বছরে কমপক্ষে ১০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী মণীশ গুপ্ত। এই বিষয়ে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতিও রূপায়ণ করা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

অর্থনীতি

● **প্রধানমন্ত্রীর তাঁতিদের ন্যায্য মজুরির পক্ষে সওয়াল :**

একদিকে, হাতে চালানো তাঁতে বোনা (হ্যান্ডলুম) পণ্যের বিশ্ব জুড়ে প্রচার। অন্যদিকে, তাঁতিদের ন্যায্য মজুরির ব্যবস্থা। হ্যান্ডলুম শিল্পকে বাঁচাতে ৭ আগস্ট জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস পালনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এই দুই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সে ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীদের এড়িয়ে তাঁতিদের আয় সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছনোর কথাও বলেন তিনি। জোর দেন হ্যান্ডলুম পণ্যগুলির ব্র্যান্ড তৈরি করে প্রচার, সিনেমায় এ রকম পোশাকের বেশি ব্যবহার বা উদ্ভাবনী নকশার ক্ষেত্রে পুরস্কার চালু করার ওপরও।

● **শেয়ার বাজারে কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড-এর টাকা :**

অবশেষে শেয়ার বাজারে যাত্রা শুরু করল কর্মী প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ)। ৬ আগস্ট প্রায় ২০০ কোটি টাকা দিয়ে শুরু হল শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ। চলতি অর্থবর্ষে পিএফ তহবিলে নতুন করে জমা টাকার ৫ শতাংশ শেয়ার বাজারে লগ্নি করা হবে। এই হিসাবে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা খাটতে পারে বাজারে।

এসবিআই মিউচুয়াল ফান্ডের এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড বা ইটিএফ-এর মাধ্যমে প্রথম শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করছেন প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ। এর জন্য ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (এনএসই) এবং বম্বে

স্টক এক্সচেঞ্জ (বিএসই)-এ নতুন দুটি ইটিএফ ফান্ড নথিভুক্ত করা হয়।

● **আমদানি ঠেকাতে ইস্পাতে ২০ শতাংশ শুল্ক :**

দেশীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষায় নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের ইস্পাত আমদানির উপর ২০ শতাংশ সুরক্ষা শুল্ক বসাল কেন্দ্র। ওই সব পণ্যের আমদানি আচমকা বেড়ে যাওয়াতেই এই পদক্ষেপ। দেশীয় সংস্থাগুলির অভিযোগ, চীন, কোরিয়া, জাপান ও রাশিয়া থেকে কিছু ইস্পাত পণ্যের সরবরাহ অত্যধিক বাড়ায় মার খাচ্ছে ভারতীয়দের ব্যবসা। সুরক্ষা শুল্ক কার্যকর থাকবে ২০০ দিন। তার মধ্যে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান পর্ব শেষ করবে সুরক্ষা দফতরের ডিরেক্টরেট জেনারেল।

● **পরোক্ষ কর সংগ্রহ বাড়ল :**

গত এপ্রিল থেকে আগস্ট, এই পাঁচ মাসে দেশে পরোক্ষ কর আদায় ৩৬.৫ শতাংশ বেড়ে পৌঁছে গেল ২.৬৩ লক্ষ কোটি টাকার উপরে। এই পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে ভারতীয় অর্থনীতির ভিত কতটা পোক্ত।

অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াতে থাকলে তবেই বাড়তে দেখা যায় পরোক্ষ কর সংগ্রহ, নচেৎ নয়। কারণ, জাতীয় আয়ের হার স্বাস্থ্যসম্মত হলে এবং উপরের দিকে এগোলে কর দেওয়ার প্রবণতা বাড়ে। আর জাতীয় আয় বাড়তে থাকার মানে অর্থনীতি চাঙ্গা হওয়া।

উল্লেখ্য, এবারের বাজেটে চলতি আর্থিক বছরে পরোক্ষ কর খাতে ৬.৪৭ লক্ষ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্র।

● **গুগ্‌লের সিইও ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুন্দর পিচাই :**

এবার থেকে গুগ্‌ল-এর সব সংস্থা চলে আসবে 'অ্যালফাবেট'-এর ছাতার তলায়। অ্যালফাবেট-এর প্রধান হলেন ল্যারি পেজ। আর প্রেসিডেন্ট সার্গেই ব্রিন। একই সঙ্গে গুগ্‌ল-এর সিইও হলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রযুক্তিবিদ সুন্দর পিচাই।

পুরো নাম সুন্দারাজন পিচাই। ১৯৭২ সালে চেন্নাইয়ে জন্ম। স্কুলের পড়া শেষ করে খড়্গপুর আইআইটি থেকে মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বি টেক করেন তিনি। এরপর উচ্চশিক্ষার জন্য মার্কিন মুলুকে পাড়ি দেন। ২০০৪ সালে গুগ্‌লে যোগ দেওয়ার পর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি এই প্রযুক্তিবিদকে।

● **বিশ্বব্যাংকের নারী, বাণিজ্য ও আইন সংক্রান্ত রিপোর্ট :**

১০ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিয়ে 'নারী, বাণিজ্য এবং আইন ২০১৬' শীর্ষক একটি নতুন রিপোর্ট পেশ করেছে বিশ্বব্যাংক। আর তাতেই দাবি করা হয়েছে যে চাকরির ক্ষেত্রে ভারতীয় মহিলাদের এখনও নানাবিধ বৈষম্য ও বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হয়। লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতিও, বলে দাবি করা হয়েছে এই প্রতিবেদনে।

তবে একটি বিষয়ে ভারতের প্রশংসা করা হয়েছে ওই রিপোর্টে। বলা হয়েছে, উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে শুধু ভারতেই শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত সংস্থাগুলির পরিচালন পর্ষদে মেয়েদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

● **আগামী সাত বছরে ছ'কোটির কর্মসংস্থান বস্ত্রশিল্পে :**

২০২২ সালের মধ্যে বস্ত্রশিল্পে কাজ করার জন্য ডাক পড়বে প্রায় ছ'কোটি দক্ষ কর্মীর। সম্প্রতি এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বস্ত্রমন্ত্রী সন্তোষ গাঙ্গোয়ার।

পরিসংখ্যান বলছে, বস্ত্র ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত নানা ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের পরিমাণ চমকে দেওয়ার মতো। শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী এবং উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যাপারে জোর দেওয়া হচ্ছে। দক্ষতাকে হাতিয়ার করেই উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে সংগঠিত বস্ত্রশিল্পে। আর তার ফলেই তৈরি হবে আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ।

বিজ্ঞান বিচিত্রা

● **পৃথিবীর 'নিয়তি' :**

জার্মানির পোস্টড্যাম ইনস্টিটিউট ফর ক্লাইমেট ইমপ্যাক্ট রিসার্চের সাম্প্রতিক একটি গবেষণার ফলাফল জানিয়েছে, মানবসভ্যতার বিনাশ হয়তো হবে আগামী সহস্রাব্দেই।

যদি এই গ্রহের কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো মজুত সব জ্বালানির সবটুকুই পুড়ে যায়, তা হলে আন্টার্কটিকায় যত বরফ রয়েছে, তার সবটুকুই গলে যাবে। সমুদ্রতল উঠে যাবে আরও পঞ্চাশ মিটার উঁচুতে। অনিবার্য হয়ে উঠবে আমাদের সলিলসমাধি। ইতিমধ্যেই সমুদ্রতলের উচ্চতা দশ শতাংশ বেড়েছে।

● **জিস্যাট-৬ কৃত্রিম উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণ :**

২৮ আগস্ট অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধবন মহাকাশ কেন্দ্র থেকে জিস্যাট-৬ কৃত্রিম উপগ্রহের সফল উৎক্ষেপণের পরে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র কর্তারা দাবি করছেন এই উপগ্রহের সাহায্যে দেশে মোবাইল প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করা যাবে। তার সুফল আমজনতা থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত সকলের কাজে লাগবে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি ওই উপগ্রহ এ দিন উৎক্ষেপণ প্রযুক্তিতেও ভারতের মুকুটে নতুন পালক জুড়ে দিয়েছে বলে ইসরো-র দাবি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে-'ডিজিট্যাল ইন্ডিয়া' তৈরির কথা বলেছিলেন, তা গড়ে তুলতেও সহায়ক হবে এই উপগ্রহ।

● **প্লুটোয় প্রাণের আশা :**

বৈজ্ঞানিক ব্রায়ান কক্সের দাবি, প্লুটোয় প্রাণ থাকলেও থাকতে পারে। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার 'নিউ হোরাইজন' মহাকাশযান এখনও পর্যন্ত প্লুটোর যা ছবি তুলে এনেছে, তার ভিত্তিতে একটা ব্যাপারে একমত হয়েছেন সব বিজ্ঞানীই!

বামন এই গ্রহটির উপরিভাগ মোড়া রয়েছে পুরু বরফের আস্তরণে। ব্রায়ান কক্সের মতে, ওই বরফের আস্তরণের নীচেই লুকিয়ে থাকতে পারে উষ্ণ সমুদ্রপৃষ্ঠ! আর তা যদি থাকে, তবে সেই পরিবেশ নিশ্চিতভাবে প্রাণের অনুকূল হবে। অবশ্য, বিশদ গবেষণা ছাড়া এ

ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

● **অ্যালঝাইমার্স-এর প্রকোপ বাড়ছে :**

ভারতে অ্যালঝাইমার্স রোগ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (২০১৪-১৫-র সমীক্ষা)। গুড়গাঁওয়ের ন্যাশনাল ব্রেন রিসার্চ সেন্টার বলছে, গোটা দেশে ২০২৫-এর মধ্যে অ্যালঝাইমার্স রোগটি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে।

'অ্যালঝাইমার্স' মূলত বার্ধক্যজনিত রোগ। মানুষের মস্তিষ্ক রাসায়নিক বা কেমিক্যালে ভরা। ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের সেলগুলি নষ্ট হতে থাকে। তখন কোনও মানুষ বা জায়গা চিনতে পারা যায় না। মস্তিষ্কের সংরক্ষণ প্রণালী নষ্ট হয়ে যায়। যে কোনও মানুষের এই রোগ হতে পারে।

● **ইবোলা টিকা :**

ইবোলা আক্রান্ত পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গিনি, সিয়েরা লিয়ন এবং লাইবেরিয়াতে আশাপ্রদ কাজ করছে ইবোলা প্রতিরোধকারী টিকা, বলে জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)।

প্রায় চার দশক আগে ১৯৭৬ সালে প্রথম ইবোলার প্রকোপের কথা জানতে পারা যায়। তারপর থেকে এ পর্যন্ত অন্তত ২৫ বার আঘাত হেনেছে এই রোগ। কিন্তু প্রতিবারই আফ্রিকার ভিতরের দিকের দেশগুলিতেই তার প্রকোপ থেমে থেকেছিল। হু-র তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ১১ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ইবোলায়।

● **আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষের হাড়গোড়ের হদিশ :**

উইটওয়াটারস্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা মারিনা এলিয়ট প্রথম পৌঁছেছিলেন জোহানেসবার্গের অদূরে রাইজিং স্টার গুহার সেই প্রকোষ্ঠে, যেখানে মিলেছে মানুষের নতুন একটি প্রজাতির পূর্বপুরুষের হাড়গোড়ের হদিশ। হাড়গোড় আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়েন্সের সবচেয়ে কাছের পূর্বপুরুষের। নাম—'হোমো নালেদি'।

এলিয়টের পরেই সেই গুহায় নেমেছিলেন একটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী। তারপর নেমেছিলেন আরও চার মহিলা। কে লিন্ডসে হান্টার, এলেন ফুয়েরিগেল, হান্না মরিস আর আলিয়া গুর্তভ।

খেলার জগৎ

● **ভিক্টোরিয়ান ওপেন-এ জয়ী জোশনা চিনাপ্পা :**

ভিক্টোরিয়ান ওপেন স্কোয়াশ প্রতিযোগিতার ফাইনালে ডেনমার্কের লাইন হ্যানসেনকে ১১-৫, ১১-৪, ১১-৯-তে হারিয়ে নিজের দশম পেশাদারি খেতাব জিতে নিলেন ভারতের জোশনা চিনাপ্পা। হ্যানসেন ছিলেন দ্বিতীয় সিড আর চিনাপ্পা তৃতীয় সিড।

পুরুষদের বিভাগে জয়ী হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার রায়ান কাসকেলি। তিনি স্কটল্যান্ডের গ্রেগ লোব্বানকে ১২-১০, ১৩-১১, ১১-৯-তে হারিয়েছিলেন।

● **পঙ্কজ আডবাণীর বিশ্বখেতাব :**

ফের জয় পঙ্কজ আডবাণীর। ওয়ার্ল্ড ৬ রেড স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জিতলেন কিউ স্পোর্টসে ভারতের পঙ্কজ আডবাণী। ধরে রাখলেন নিজের তাজও। ফাইনালে পঙ্কজ আডবাণী ৬-২ হারান চীনের ইয়ান বিংগতাওকে।

এই চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে পঙ্কজ আডবাণী নিজের কেরিয়ারের ১৩ নম্বর বিশ্বখেতাবও জিতলেন।

● **হিঙ্গিসকে সঙ্গী করে ইউএস ওপেনে জয় সানিয়া ও পেজের :**

ইউএস ওপেনে লিয়েন্ডার পেজকে নিয়ে মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতলেন মার্টিনা হিঙ্গিস। আর এর মাত্র দু'দিন পরেই এক নম্বর জুটির মতোই খেলে ইউএস ওপেনে মেয়েদের ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হল সানিয়া মির্জা-মার্টিনা হিঙ্গিস জুটি।

লুই আর্মস্ট্রং স্টেডিয়ামে প্রায় মিক্সড ডাবলস ফাইনালে শীর্ষ বাছাই পেজ-হিঙ্গিস জুটি স্থানীয় মার্কিন জুটি বেথানি মাটেক-স্যাম কুয়েরির প্রবল চ্যালেঞ্জকে সুপার টাইব্রেকে মুছে দেন। ছেচল্লিশ বছর পর (শেষ বার ১৯৬৯-এ) গ্র্যান্ড স্ল্যামে একই জুটি এক বছরে তিনটে মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতল।

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলীয়-কাজাখ জুটিকে সানিয়া মির্জা-মার্টিনা হিঙ্গিস হারান। ১৭ বছর পর ইউএস ওপেনের ডাবলস খেতাব জিতলেন এই সুইস তারকা। আর ডাবলসে সানিয়া মির্জার এটি বছরের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম।

● **টিম ডিরেক্টর থাকছেন রবি শাস্ত্রীই :**

২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দলের টিম ডিরেক্টর পদে বহাল রইলেন রবি শাস্ত্রী। আগামী বছর মার্চ-এপ্রিলে ভারতেই বসবে এই বিশ্বকাপের আসর।

তাঁর কোচিংয়ে দল ভালো খেলছে, তাই শাস্ত্রীকে পদে রেখে দেওয়ার সুপারিশ করে সচিন তেন্ডুলকর, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভিভিএস লক্ষ্মণের তিন সদস্যের বিসিসিআই-এর অ্যাডভাইসরি কমিটি।

শাস্ত্রী ছাড়াও সহকারী কোচের পদে সঞ্জয় বাঙ্গার, ভরত অরুণ এবং এস শ্রীধরকেও রেখে দেওয়ার সুপারিশ করেছে অ্যাডভাইসরি কমিটি। কমিটির সুপারিশ মেনে নিয়েছে বিসিসিআই।

বিবিধ সংবাদ

● **ভারতীয় সেনাবাহিনী ফেসবুকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে :**

পিপল টকিং অ্যাবাউট দ্যাট (পিটিএটি) র‍্যাঙ্কিংয়ের বিচারে জনপ্রিয়তার নিরিখে শীর্ষস্থান লাভ করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফেসবুক পেজ। ফেসবুকের যে পেজটি নেটিজেনরা সবচেয়ে পছন্দ করছেন অথবা সবচেয়ে বেশি বার সেই পেজে ভিজিট করছেন, সেই সংখ্যার উপর ভিত্তি করেই বেছে নেওয়া হয় পিটিএটি র‍্যাঙ্কিং।

২০১৩ সালে ১ জুন ফেসবুকে অফিশিয়াল অ্যাকাউন্ট খোলে

সেনাবাহিনী। ফলোয়ারের সংখ্যা ৩০ লাখ ছুঁই ছুঁই। সেনাবাহিনীর টুইটার হ্যান্ডেলের ফলোয়ারের সংখ্যা প্রায় পৌনে পাঁচ লাখ। প্রতি সপ্তাহে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অশিসিয়াল ওয়েব সাইট ভিজিট করেন প্রায় ২৫ লাখ জন। এর থেকেই প্রমাণ হয় সাধারণ মানুষের কাছে ধীরে ধীরে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছে সেনার এই প্রচেষ্টা।

● **অ্যাগাথা ক্রিস্টির নতুন ১০টি নাটকের সন্ধান :**

সম্প্রতি খোঁজ পাওয়া গেল ব্রিটিশ গোয়েন্দা ঔপন্যাসিক অ্যাগাথা ক্রিস্টির নতুন ১০টি নাটকের। ব্রিটিশ নাট্য পরিচালক জুলিয়াস গ্রিন জানিয়েছেন, বিভিন্ন সংরক্ষণাগার, ক্রিস্টির পরিবার এবং তাঁর নাটকের প্রযোজকদের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে ১০টি অজানা নাটকের সন্ধান পেয়েছেন তিনি।

নতুন নাটকগুলি প্রকাশিত হবে গ্রিনের আসন্ন বই 'কার্টেন আপ অ্যাগাথা ক্রিস্টি-এ লাইফ ইন থিয়েটার'-এ। সন্ধান পাওয়া নাটকগুলির মধ্যে ৫টি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের এবং ৫টি একাঙ্ক। নাটকগুলির মধ্যে কয়েকটি একেবারেই অজানা এবং কয়েকটি দীর্ঘকাল বিস্মৃত। তবে প্রতিটি নাটকই 'মার্ডার মিস্ট্রি'।

● **ঝুম্পা লাহিড়ীকে মার্কিন জাতীয় মানবিক পদক :**

ঝুম্পা লাহিড়ীকে জাতীয় মানবিক পদকে সম্মানিত করল মার্কিন প্রশাসন। ১০ সেপ্টেম্বর হোয়াইট হাউজে তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

কতিপয় যে সব ভারতীয় ইংরেজি ভাষায় লেখালেখির জন্য বিখ্যাত তাঁদের মধ্যে ঝুম্পা লাহিড়ী অন্যতম। বর্তমানে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় যুক্ত তিনি। ২০০০ সালে 'ইন্টারপ্রেটার অব ম্যালাডিজ'-এর জন্য পান ঐতিহ্যবাহী পুলিৎজার পুরস্কার। ম্যান বুকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয় তাঁর লেখা 'লো ল্যান্ড'। তাঁর লেখায় বারেবারে ফিরে এসেছে অনাবাসী ভারতীয়দের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-একাকিত্বের অভিজ্ঞতার বর্ণনা।

● **বিশ্বের সবচেয়ে 'ছোট মানুষ' প্রয়াত :**

মারা গেলেন বিশ্বের সবচেয়ে 'ছোট মানুষ' চন্দ্রবাহাদুর ডাঙ্গি। তাঁর উচ্চতা ছিল ২১.৫ ইঞ্চি। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। নেপালের বাসিন্দা চন্দ্রবাহাদুর ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে ছোট মানুষ, এমনটাই দাবি গিনেস বুকের। ২০১৩ থেকে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে এ তথ্য নথিভুক্ত হয়।

কাঠমাণ্ডু থেকে ৪০০ কিলোমিটার দূরে এক গ্রামে থাকতেন তিনি। তবে গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে তাঁর নাম ওঠার পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে যেতেন। সম্প্রতি আমেরিকায় গিয়েছিলেন চন্দ্র। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

● **কচ্ছপদের 'উসেইন বোল্ট' :**

দৌড়ের ইতিহাসে প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়ে গিনেস বুকে নাম তুলেছে বার্টি। কিন্তু এই বার্টি আসলে একটি কচ্ছপ। অভাবনীয় গতির জন্য ইতিমধ্যেই তাকে 'কচ্ছপদের উসেইন বোল্ট' নামে ডাকা শুরু হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের ডারহ্যামে একটি বিনোদন পার্ক 'অ্যাডভেঞ্চার ভ্যালি'-তে বাস বার্টির। দশ বছরের বার্টি ১৮ ফুট পথ অতিক্রম করেছে মাত্র ১৯.৫৯ সেকেন্ডে। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ৪৯.৭ সেকেন্ডের। সময়ের পার্থক্য থেকেই পরিষ্কার, কতটা দ্রুত বার্টি। এই গতিতে ১০০ মিটার টপকাতে তার সময় লাগবে মাত্র ছ'মিনিট।

● **পশু-পাখির আঁকা ছবির নিলাম :**

ক্যালিফোর্নিয়ার ওকল্যান্ড চিড়িয়াখানায় হাতি, সিংহ থেকে সাপ, বানর—যে যার ইচ্ছামতো রাঙিয়ে তুলল ক্যানভাস। ৩২টা ছবি অনলাইন নিলামে তোলা হয়েছে। ন্যূনতম দর ২০০ ডলার থেকে শুরু।

ওকল্যান্ড চিড়িয়াখানায় গত বছর থেকে এই অভিনব শিল্পচর্চা শুরু হয়েছে। প্রথমবার মাত্র ১২টি ছবি নিলাম করে ১০ হাজার ডলার আয় হয়েছিল। চিড়িয়াখানার কর্মীরাই পশু-পাখিদের ছবি আঁকতে সাহায্য করেছেন। চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বন্যপ্রাণ সংরক্ষণেই এই অর্থ কাজে লাগানো হবে।❑

সংকলক : পম্পি শর্মা রায়চৌধুরী

The Collected Works of Mahatma Gandhi available in Electronic Version

The Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG), a set of 100 volume books, running into over 55,000 pages, are now available in an electronic version to ensure easy accessibility for people across the globe. This e-version (eCWMG) was launched by Shri Arun Jaitley, Minister for Information and Broadcasting, Finance and Corporate Affairs on September 8, 2015, in the presence of Col. Rajyavardhan Rathore (Retd.), Minister of State for Information and Broadcasting at Gandhi Peace Foundation, New Delhi.

The Minister also initiated the uplink of this e-version on the Gandhi Heritage Portal, which is maintained by Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust with the support of Ministry of Culture, Govt. of India.

Shri Arun Jaitley, Hon. Minister for Information and Broadcasting, Finance and Corporate Affairs, launches the e-Version of the Collected Works of Mahatma Gandhi, and initiates its uplink on the Gandhi Heritage Portal. Col. Rajyavardhan Rathore (Retd.), Minister of State for Information and Broadcasting and Ms Dinaben Patel, renowned Gandhian scholar were also present.

Speaking on the occasion, Shri Jaitley said that the digitized version of the Collected Works of Mahatma Gandhi would be instrumental in preserving the valuable national heritage and disseminating it for all humankind. Emphasising on the intrinsic value of the e-CWMG Project, Shri Jaitley added that this project has the collaboration of institutions that have been founded and nurtured by Gandhiji himself. Shri Jaitley also announced that the Hindi version of this monumental work, the Sampoorna Gandhi Vangmaya, would be digitized soon.

In September, 2011, Publications Division entered into an MoU with Gujarat Vidyapith, Ahmedabad for bringing out the electronic version of CWMG. A Committee comprising of eminent Gandhian experts - Prof. Sudarshan Iyengar, Former VC of Gujarat Vidyapith (GV), Ms. Dinaben Patel, an eminent Gandhian scholar and Shri Tridip Suhrud, Director, Sabarmati Ashram Preservation and Memorial Trust (SAPMT) supervised this meticulous work and ensured its authenticity in all respects.

The Collected Works of Mahatma Gandhi (CWMG), published by the Publications Division during 1956-94, is a monumental document of Gandhiji's words which he spoke and wrote, day after day, year after year 1884 till his assassination on January 30, 1948. In this series, Mahatma's writings, scattered all over the world, have been collected and constructed with stringent academic discipline.

Published on 10th of every month
Posted on 12-13 of every month
DHANADHANYE (Yojana-Bengali)
Price Rs. 20.00

October, 2015
R.N.I. No. 19740/69

Subscription Coupon

[For New Membership / Renewal / Change in Address]

I want to subscribe to _____ (Journal's name & language)

☐ 1. yr. for Rs. 100/- ☐ 2. yrs. for Rs. 180/- ☐ 3. yrs. for Rs. 250/-

DD/MO No. _____ Date _____

Name (in block letters) _____

Category Student / Academician / Institution / Others

Address _____

_____

PIN ☐☐☐☐☐☐

Phone _____

P.S. : For Renewal / change in address — please quote your subscription No. ☐

Please allow 8 to 10 weeks for the despatch of 1st issue.

ATTENTION PLEASE

The DD/MO should be drawn in favour of :

The Editor

Dhanadhanye (Yojana - Bengali)

Publications Division

8, Esplanade East, Kolkata-700 069

কেন্দ্রীয় তথ্য এবং সম্প্রচার মন্ত্রকের পক্ষে প্রকাশন বিভাগের অতিরিক্ত মহানির্দেশক, শ্রীমতি সাধনা রাউত কর্তৃক
৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট, কলকাতা-৭০০ ০৬৯, ফোন ঃ ২২৪৮ ২৫৭৬ থেকে প্রকাশিত এবং
ইস্ট ইন্ডিয়া ফটোকম্পোজিং সেন্টার, ৬৯, শিশির ভাদুড়ী সরণী, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত।